'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' ষষ্ঠ সংখ্যা

প্রাণের স্রোত

বিজ্ঞান ভিক্ষু

বেঙ্গল ম্যাস্ এডুকেশন সোসাইটি
৯৯।১ এক, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার
কলিকাতা, ৪।

সূচী

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন ! তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

হে অর্জ্জুন ! ঈশ্বর, নিজ মায়া দ্বারা যন্ত্রস্থ বস্তুর ন্যায় সর্ব্বভূতকে ঘুরাইয়া সকল ভূতের হৃদয়েই বাস করিতেছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮।৬১

প্রাণের স্রোত

শ্রীকৃষ্ণ :—

পশ্য মে পার্থ! রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥

হে পার্থ! আমার নানাপ্রকার বর্ণ ও আকারবিশিষ্ট শত সহস্র দিব্য রূপ দেখ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১১।৫

প্রাণের স্রোতের ক্রমোন্নত শাখা ও উপশাখা

১। **বহুমুখী (Porifera) : স্পঞ্জ** (Sponges)

২। **একোদর (Coelenterata) :** (ক) বহুশীর্ষ (Hydra)

(খ) সমুদ্র-পুষ্প (Sea-anemones) (গ) অষ্ট শুণ্ড (Jelly fishes)

৩। **কণ্টকচর্ম্ম (Echinoderms) :** (ক) পঞ্চ শুণ্ড (Star fishes)

(খ) ভঙ্গুর মৎস্য (Brittle stars) (গ) পাথুরে পদ্ম (Stone lilies)

(ঘ) সামুদ্রিক কদম্ব (Sea-urchins) (ঙ) সামুদ্রিক শশা (Sea-cucumbers)

৪। **চক্রদেহ (Annelids) :** (ক) কেঁচো (Earth worms)

(খ) জোঁক (Leeches) (গ) কেন্নো (Sand worms)

৫। **যুক্তপাদ (Arthopods)**

(ক) পতঙ্গ (Insects) (গ) কাঁকড়া (Crustacea)

(খ) বিছা (Centepedes) (ঘ) মাকড়সা (Spider)

৬। **কড়ি (Molluscs) :** (ক) শুক্তি (Oysters)

(খ) বহুপদ (Cephalopods) (গ) শামুক (Snails)

৭। **মৎস্য (Fish)**

৮। **উভচর (Batrachians)**

(ক) ব্যাঙ (Frogs) (খ) চতুষ্পদ (Salamandars)

৯। **সরীসৃপ (Reptiles)**

(ক) কচ্ছপ (Turtles) (গ) টিকটিকি (Lizards)

(খ) কুমীর (Crocodiles) (ঘ) সাপ (Snakes)

১০। **স্তন্যপায়ী (Mammals)**

১১। **পক্ষী (Birds) :** (ক) উটপক্ষী (Ostrich)

(খ) পায়রা (Pigeons) (গ) শকুন (Eagles)

১২। **বাদুড় (Bats)** ১৩। **মানব (Man)**

প্রাণের লীলা এক বিন্দু জলে
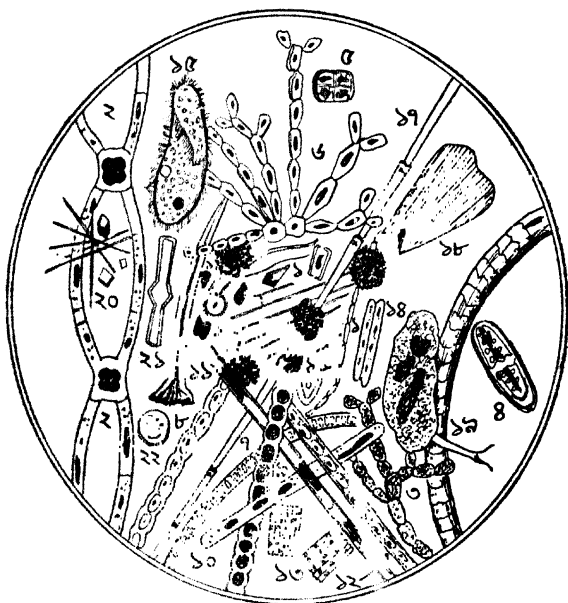
তীব্র-দৃষ্টি অনুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে এক বিন্দু জলে যে অনুপ্রাণগুলি ধরা পড়ে উহাদিগের প্রকৃত আকারের বহু গুণ বর্দ্ধিত আকার দেওয়া গেল।

প্রাণের স্রোত

১

একবিন্দু জলে

গভীর ভূগর্ভ হইতে ঝরণার মুখে উঠা পরিষ্কার জলে, কোন জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায় না। জলীয় বাষ্প শীতল হইয়া জলে পরিণত হইলে, ঐরূপ জলেও কোন প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায় না। সাবধানে পরিস্রুত জলেও প্রাণের স্রোত বহে না। বৃষ্টির জলে মাঝে মাঝে শুষ্ক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু-প্রাণের (Spores) পরিচয় পাওয়া যায় বটে; কিন্তু সাধারণ নদী, নালা, অগভীর কূপ বা পুকুরের একবিন্দু জলে যে অফুরন্ত প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা চক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করা দায়।

প্রাণের বিকাশের জন্য প্রচুর খাদ্যের প্রয়োজন। নদী, নালা, পুকুরের সাধারণ জলে এই অফুরন্ত খাদ্যের অভাব নাই। এই সকল জলে বিকারশীল জীব ও উদ্ভিদের অপরিমেয় প্রাণের নূতন নূতন আধার গড়িয়া উঠিবার পক্ষে অনুকূল। কিন্তু এই অফুরন্ত প্রাণপূর্ণ জল যখন চুয়াইয়া চুয়াইয়া বালি, কাদা, কাঁকরের স্থূল স্তরগুলি পার হইয়া ভূগর্ভের গভীর প্রদেশে গিয়া সঞ্চিত হয়, তখন ঐ সংখ্যাতীত জান্তব, উদ্ভিদ জলচরগুলি উপরের স্তরে স্তরে ছাঁকিয়া থাকিয়া যাওয়ায়, ঐ গভীর ভূগর্ভস্থ জল হয় অতি স্বচ্ছ ও নির্ম্মল।

মানুষ প্রকৃতির অনুকরণেই আপনার পানীয় জল বিশুদ্ধ করিয়া লইতে শিখিয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটির জল ছাঁকিবার জলাশয়গুলিতেও ঐরূপ ভাবেই স্তরে স্তরে বালি, কাঁকরাদি দিয়া জান্তব ও উদ্ভিদ মল ছাঁকিবার ব্যবস্থা করা হয়।

একবিন্দু জল অণুবীক্ষণে প্রায় নব্বই হাজার গুণ বড় করিয়া দেখিলে যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু-জীবগুলির অস্তিত্ব ধরা পড়ে তাহারই ছবি পাশে দেওয়া গেল। ইহাপেক্ষাও তীব্রদৃষ্টি অণুবিক্ষণ দিয়া দেখিলে রোগের জীবাণুগুলির (Microbes বা Bacteria) অস্তিত্ব ধরিতে পারা যায়। যে-জলে বিকারশীল (Decomposing) জৈব (Organic) উপাদান থাকে, উহার প্রতি বিন্দুতে দুই তিন বা বহু সহস্র মারাত্মক রোগের বীজাণু থাকা আশ্চর্য্য নহে।

তাহা হইলে সাধারণ জল পান করা কি বিপজ্জনক? মোটেই নয়। তবে যে জলাশয়ে নর্দ্দমার জল গিয়া পড়ে, সে জলাশয়ের জল না ফুটাইয়া খাওয়া বিষ খাওয়ারই মত। সাধারণ জলাশয়ের জল না ফুটাইয়া, বা বালি কাঁকরাদি দিয়া না ছাঁকিয়া, ব্যবহার করা উচিত নয়। জলে রোগবাহী (Pathogenic) বীজাণু না থাকিলেও কৃমি আদির ডিম বা কীট জলের সহিত পেটে যাইলে কৃমি রোগ হইতে পারে। পানীয় জলে দুই চারি দিনেই কৃমি হইতে দেখা যায়। এইগুলি ঐরূপ ভাবেই জন্মে। সেইজন্য জল ফুটাইয়া ও ছাঁকিয়া খাওয়াই নিরাপদ।

জলে জান্তব ও উদ্ভিদ উভয় প্রকার জীবাণুই দেখিতে পাওয়া যায়। এই জীবাণুগুলিই জাতিতে ও সংখ্যায় অসংখ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বহুমুখী জীব (Porifera)

২

স্পঞ্জ

বাজারের স্পঞ্জ—স্পঞ্জের কঙ্কাল

পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল স্পঞ্জ উদ্ভিদধারাভুক্ত; কিন্তু এখন ধরা পড়িয়াছে যে ইহা একপ্রকার প্রাণী এবং ইহা বহুকোষ-প্রাণীর মধ্যে নিম্নতম পর্য্যায়ভুক্ত। এক টুকরা বাজারের স্পঞ্জ লইয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে উহা শক্ত কাঁটার মত সুতার এক অতি জটিল বুনন মাত্র। বাজারে যে স্পঞ্জ বিক্রয় হয়, উহা প্রকৃত স্পঞ্জ নহে, উহার কঙ্কাল মাত্র।

এই কাঁটার বুনন কঙ্কাল ও জেলির মত নরম এক প্রকার পদার্থ পিণ্ডের সমবায়ে স্পঞ্জের দেহ গঠিত। স্পঞ্জ তাহার কঙ্কাল গড়িবার মত পদার্থ জল হইতে গ্রহণ করে। জলের চুণ লইয়া ইহার কোন কোন জাতি নিজের কঙ্কাল গড়ে, কিন্তু অধিকাংশ জাতি জলের সিলিকার (বালি) আপনার কঙ্কাল গড়িয়া তুলে।

স্পঞ্জ—বহুমুখী জীবের নমুনা

বৈজ্ঞানিকগণ জীবধারাকে কয়েকটি পর্য্যায়ে ভাগ করিয়াছেন। বহুকোষ প্রাণীধারায় স্পঞ্জের স্থান নিম্নতম এবং মানব উহার উচ্চতম শিখরে আসীন। স্পঞ্জকে বহুমুখী জীবকুলের নমুনাস্বরূপ ধরা চলে। ইহার দেহে অসংখ্য ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র দিয়া উহা আহার গ্রহণ করে এবং নিশ্বাসের অক্সিজেন মিশ্রিত জল গ্রহণ করে।

জীবধারার নিম্নতম পর্য্যায়ের জীবগুলিতে দেহের নানা যন্ত্রগুলি রূপ গ্রহণ করে না। ফলে স্পঞ্জের মত নিম্নতম শ্রেণীর জীবগুলিকে আপন আপন ধারা বজায় রাখিবার জন্য বিশেষ কিছু করিতে হয় না। ইহার মস্তক, লাঙ্গুল বা

অন্যান্য কোন অঙ্গই জন্মে নাই। উন্নত জীবকুলের দেহমধ্যস্থ যন্ত্রগুলির মত কোন যন্ত্রেরই ব্যবস্থা নাই। ডিম হইতে ফুটিয়া কিছুদিন ছুটাছুটি করিবার পর ইহা স্থাণু জীবে পরিণত হয়।

স্পঞ্জের জন্ম

কতকগুলি কোষের সমষ্টি-স্বরূপ স্পঞ্জের দেহেই উহার ডিম জন্মায়। এই ডিমগুলি এত ক্ষুদ্র যে ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাসের (Magnifying glassএ ছোট
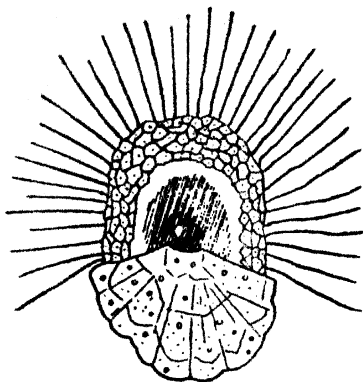
ডিম হইতে ফুটিবামাত্র শিশু-স্পঞ্জের রূপ

জিনিসকে বড় করিয়া দেখায়) সাহায্য ব্যতীত দেখিতে পাওয়া যায় না। এই ডিম ফুটিয়া একটী ক্ষুদ্র ডিম্বাকার জীব বাহির হইয়া জলে ইচ্ছামত সাঁতার দিয়া বেড়ায়। এইগুলিই শিশু-স্পঞ্জ।

স্পঞ্জ-শিশুর ছুটিয়া বেড়ান বেশী দিনের জন্য নহে। কয়েকদিনের মধ্যেই সমুদ্রতলে গিয়া উহা কোন প্রস্তরখণ্ডে লাগিয়া গিয়া বাড়িতে থাকে। কোনটির আকার হয় বাটীর মত, কোনটির হয় গোলাকার। আবার কোনটি, ভেলভেটের মত, পাথরের উপর ছড়াইয়া বাড়িতে থাকে।

স্পাঞ্জের দেহের গঠন

স্পাঞ্জের বিভিন্ন কোষগুলি বিভিন্ন কাজে লাগিয়া যায়। কতকগুলি জল হইতে সিলিকা লইয়া আপন কঙ্কাল গড়িতে ব্যস্ত হয়। কতকগুলি আহার হজম করিবার উপযুক্ত রস প্রস্তুত করিতে থাকে। আবার কতকগুলি বা ডিম্ব সৃষ্টি করে।

স্পঞ্জের দেহের ছিদ্রগুলির গায়ের আবরণ তরঙ্গাকারে অবিরাম উঠা-নামা করে। ছিদ্রপথের চর্ম্মের এই তরঙ্গাকারে উঠা-নামার ফলে সমুদ্রের জল দেহের
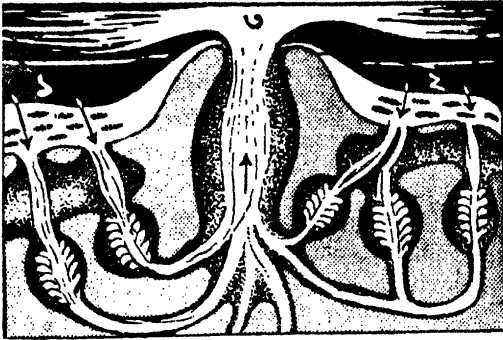
১ ও ২ চিহ্নিত পথে জলের সহিত আহার প্রবেশ করে। ৩ চিহ্নিত পথে জল ও মলাদি বাহির হয়

মধ্যে প্রবেশ করিবার পথ পায়। সমুদ্রের জলে সংখ্যাতীত এককোষ জীব জন্মায়। এইগুলি জলের সহিত স্পঞ্জের দেহে প্রবেশ করে। জলে মুক্ত অবস্থায় জীবের প্রাণস্বরূপ অক্সিজেনের অভাব নাই। স্পঞ্জ এইরূপ বায়ু ও আহার পাইয়া বাড়িতে থাকে। জল হইতে বায়ু ও আহার গ্রহণ করিবার পর স্পঞ্জ অপ্রয়োজনীয় জল উহার দেহের বড় বড় ছিদ্রপথে বাহির করিয়া দেয়।

বৎসরের এক সময়ে স্পঞ্জের দেহে ডিম জন্মগ্রহণ করে। এই ডিমগুলি উহার দেহে ফুটিয়াই শিশু-স্পঞ্জ বাহির হয়। ঐ বৃহৎ ছিদ্রপথে শিশু-স্পঞ্জগুলিও অপ্রয়োজনীয় জলের সহিত বাহির হইয়া জলে কিল্‌বিল্ করিয়া বেড়ায়। ইহাই স্পঞ্জের সরল জীবন-যাত্রার মোটামুটি ইতিহাস।

স্পঞ্জ সংগ্রহ

বাজারে যে স্পঞ্জ বিক্রয়ের জন্য আসে, সেগুলির অধিকাংশ ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বাংশ ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ হইতে প্রাপ্ত। বাজারের সেরা স্পঞ্জগুলি তুর্কিদেশ হইতে আসে। ঐ দেশে স্থানীয় ডুবুরীরা সমুদ্রগর্ভে কৌপীন সম্বল করিয়া নামিয়া গিয়া, প্রায় মিনিটখানেকের মধ্যে যতগুলি সম্ভব স্পঞ্জ পাথরের গা হইতে ছিঁড়িয়া আনে। ঐ স্পঞ্জগুলিকে তীরে লইয়া গিয়া ধুইয়া নিংড়াইয়া ফেলিলে উহাদের কঙ্কাল ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই স্পঞ্জের কঙ্কালগুলিকে শুখাইয়া লইয়া বাজারে বিক্রয়ের জন্য পাঠান হয়। সমুদ্রগর্ভে নানা রংএর স্পঞ্জ দেখিতে পাওয়া যায়। তুষারশুভ্র হইতে আরম্ভ করিয়া, কমলা, লাল, উজ্জ্বল সবুজ—কোন রংএরই অভাব নাই।

একোদর জীব (Coelenterata)

৩

অষ্ট-শুণ্ড বা জেলি মৎস্য (Jelly Fish)

প্রথমে প্রাণের বিকাশ এককোষ আধারে জলা-ভূমিতে ঘটে। তাহার বহু পরে বর্ত্তমান হইতে প্রায় দুই তিন কোটি বৎসর পূর্ব্বে, বহুকোষ আধারে প্রাণের উন্মেষ ঘটিতে লাগিল। ক্রমশঃ বহুকোষ আধারে বর্ত্তমান কালের স্পঞ্জ, জেলি মৎস্য প্রবাল, শামুক আদির মত জীব দেখা দিল। উদ্ভিদ জগতে সামুদ্রিক

দল, শ্যাওলা ও অশ্বপুচ্ছের (Horse tail) মত আধার ও স্থলচরের মধ্যে কয়েকটি কীট পতঙ্গের মত আধার বোধ হয় সে যুগে দেখা দিয়াছিল মাত্র।

আকার

সমুদ্রের ধারে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিলে ব্যাঙের ছাতার মত একপ্রকার জীব সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ যাহা দৃষ্টিগোচর হয়, সেগুলির আকার চায়ের বাটি হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় থালার মত হয়। সাধারণ রং স্বচ্ছ সাদা; তবে কোন কোনটিতে মনোহর রংএর ছিট্‌ দুর্লভ নহে। দেখিলে মনে হয়, সাদা জেলি যেন বাটির ছাঁচে ফেলিয়া জমাইয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রধান অঙ্গ

জেলি মৎস্যের প্রধান অঙ্গটি ছত্রাকার। ইহার ছত্রটির ব্যাস সাধারণতঃ প্রায় চারি ইঞ্চি। ছাতার ধার হইতে, অর্দ্ধ ইঞ্চি তফাতে তফাতে, দুই ইঞ্চি দীর্ঘ কয়েকটি ঝুরি নামিয়াছে। ছাতার মধ্যস্থল হইতে প্রায় তিন ইঞ্চি দীর্ঘ, চারিটি শুঁড়ি নামিয়াছে। ঐ শুঁড়ি চারিটি ছাতার মধ্যস্থলে জোড়া, কিন্তু নিম্নদিকে উহারা পৃথক। শুঁড়ি চারিটির শীর্ষদেশে জেলি মৎস্যের মুখটি অবস্থিত। এক কথায় দাঁড়ায় জেলি মৎস্য ব্যাঙের ছাতার মত দেখিতে, কেবল ব্যাঙের ছাতার ডাঁটিটি, জেলি মৎস্যে, চারিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

জননেন্দ্রিয়

যে জলে ইহার বাস, সেই জলেরই অনুরূপ ইহার রং, কিন্তু স্বচ্ছ। স্বচ্ছ ছাতার উপর দিয়া দেখিলে চোখে পড়ে—ছাতার ভিতরে ঘোড়ার নালের আকারে, গাঢ় হরিদ্রা বর্ণের চারিটি দাগ। ইহাদের মুখগুলি ছাতার কেন্দ্রের দিকে হাঁ করিয়া আছে। এইগুলি জেলি মৎস্যের জননেন্দ্রিয়। জেলি মৎস্যাধারে জীবের নর নারীর পৃথক সত্তা দেখা দিয়াছে।

বৈজ্ঞানিকগণ প্রাণের স্রোতকে কয়েকটি বিশেষ ধারায় ভাগ করিয়াছেন।

জেলি মৎস্তকে তাঁহারা উদরসর্ব্বস্ব জীবধারায় ফেলিয়াছেন। ইহাদের জননে-ন্দ্রিয় ব্যতীত আর বিশেষ কোন আভ্যন্তরিক দেহযন্ত্রই বিকশিত হয় নাই। উক্ত ইন্দ্রিয় ব্যতীত ইহারা সারা দেহটিই একটি পাকাশয় বলিলেও ভুল হয় না। সামুদ্রিক য়্যানিমোনিস্ (Sea anemones) ও প্রবাল (coral) এই ধারাভুক্ত।

অন্যান্য ইন্দ্রিয়

দূর হইতে দেখিলে ইহাকে বাটির আকারে জমান জেলির ছাঁচ বলিয়া ভুল হইতে পারে ; কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, এই জীবাধারে চক্ষু, কর্ণ, স্নায়ু ও মাংসপেশী ক্রমশঃ ফুটিতেছে দেখা যায়। ইহাদের ছত্রের কিনারায় যে মাংসপেশী আছে উহার ধীর ও নিয়মিত সঙ্কোচন ওসম্প্রসারণ ঘটে, ফলে ছাতাটি একবার একটু খোলে ও আবার বন্ধ হয়। ইহাতে একটা ছন্দবদ্ধ স্পন্দন উঠে। জেলি মৎস্ত যদি ঠিক আড়াআড়ি ভাবে (horizontally) থাকিত, তাহা হইলে উক্ত স্পন্দনের ফলে ছাতাটিকে একই স্থানে তালে তালে নাচিতে দেখা যাইত। কিন্তু ছাতাটি একদিকে সামান্য হেলিয়া থাকায় উক্ত স্পন্দনের তালে তালে জেলি মৎস্তটি অগ্রগতি লাভ করে।

ছাতার কিনারায় ঝুঁরগুলির ঠিক মাঝে মাঝে, ক্ষুদ্র গোলাকার একটি করিয়া অঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, এইগুলি ইহার চক্ষু। নানা জেলি মৎস্যে এই দর্শনেন্দ্রিয়টি নানারূপ ফুটন্ত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। কোনটিতে মাত্র এক একটি রঙীন দাগ বা ক্ষুদ্র স্নায়ুকেন্দ্র ; আবার কোনটিতে সাধারণ জীবেরই মত রীতিমত তারা (লেন্স—Lens) দেখা দিয়াছে। এইরূপ ছাতার কিনারায় আবার কোন কোন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গ দেখা যায়, যেগুলি দিয়া উহারা শুনিতে পায়। এই অঙ্গটিও, নানা জেলি মৎস্যে, নানাপ্রকার বিকশিত অবস্থায় দেখা যায়।

আক্রমণের অস্ত্র

জেলি মৎস্তের ধারাভুক্ত সকল প্রাণীরই হুল দেখা যায়। এই হুলের আক্রমণে উহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল প্রাণীকে অবশ করিয়া মারিয়া ফেলে। জেলি

মৎস্যে এই হুল খুব কার্য্যকর ও তীক্ষ্ণ। ফলে ইহার ঝুরির নিকটে কোন ক্ষুদ্র প্রাণী আসিয়া পড়িলে, উহাকে হুল দিয়া অবশ করিয়া বা মারিয়া ফেলিয়া ঝুরি দিয়া আঁকড়াইয়া ধরে, তাহার পরে ঐ ঝুরিই উক্ত মৃত শিকারটি মুখে তুলিয়া ধরে। ঝুরিগুলি ইহাদের হস্ত বলিলেই হয়। ইহাদের হুলের তীব্র জ্বালা মানুষেও বেশ টের পায়। সমুদ্র-স্নানার্থীরা মাঝে মাঝে উহা বেশ ভাল করিয়াই অনুভব করে।

জেলি মৎস্যের ছানার জন্ম ও বাড়

স্ত্রী-জেলি মৎস্যের ডিম্বকোষের ডিমগুলি, পুরুষ-জেলি মৎস্যের বীজে প্রাণবন্ত হইয়া পূর্ণতা লাভ করিলে, ঐগুলি পাকাশয়ে গিয়া উপস্থিত হয় এবং সেই স্থান হইতে মুখবিবর দিয়া জলে আসিয়া পড়ে। তাহার পর সমুদ্রের তলদেশে গিয়া কোন পাথরের টুকরা ধরিয়া বাড়িতে থাকে। কোন কোন জাতীয় জেলি মৎস্যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ক্ষেত্রে মাতৃদেহের

জেলি মৎস্যের ক্রমবিকাশ

অভ্যন্তরেই ছানা পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয় এবং মুখ দিয়া জলের সহিত নিক্ষিপ্ত হইয়া মুক্তি পাইলে ঝাঁকে ঝাঁকে সাঁতার দিয়া বেড়ায়।

এই মৎস্যের ডিম জলে পড়িয়া কোন পাথরের টুকরায় আপনাকে বাঁধিয়া বাড়িতে আরম্ভ করিলে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। ঐ ডিম হইতে ফুটিয়া উহা প্রথমে এক অতি ক্ষুদ্র সমুদ্র অ্যানিমোনির আকার গ্রহণ করে। ইহার শীর্ষদেশের কিনারায় তখন শুঁড়গুলি দেখা দেয় এবং ইহার মুখবিবর থাকে শুঁড়গুলির মধ্যস্থলে। প্রায় সিকি ইঞ্চি গাড়ুর পেটের মত বাড়িবার পর, ইহার দেহে কয়েকটি খাঁজ দেখা দেয় এবং প্রত্যেক খাঁজের ধারে ধারে আটটি করিয়া শুঁড় বাহির হয়। তখন ঐ অদ্ভুত সামুদ্রিক জীবটিকে দেখিতে হয় একথাক খাঁজ-কাটা বাটির মত। তাহার পর ফুলের খসা-পাপড়ির মত একে একে কয়েক ঘণ্টা অন্তর বাটিগুলি শীর্ষদেশ হইতে খসিতে আরম্ভ করে এবং উপুড় হইয়া ভাসিতে থাকে। তখন ইহাকে ঠিক জেলি মৎস্যের মত দেখিতে হয়। এইরূপ অদ্ভুত উপায়ে একটিমাত্র ডিম হইতে বহু জেলি মৎস্যের আবির্ভাব ঘটায়; প্রথমে যে স্থানে মাত্র কয়েকটি জেলি মৎস্য দেখা দিয়াছিল, তথায় কয়েকদিনের মধ্যেই জেলি মৎস্যের গাদি লাগিয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জেলি মৎস্যের ছাতার ভিতরের দিকে প্রজননের উদ্দেশ্যে চারিটি ফাঁক থাকে, দেখিতে অনেকটা নলের মুখের মত। জেলি মৎস্যের সংস্পর্শে আসিলে ক্ষুদ্র জলচরের আর রক্ষা নাই, তথাপি আশ্চর্য্যের কথা এই যে উল্লিখিত থলিগুলিকে কয়েকপ্রকার অতি ক্ষুদ্র মৎস্য ও কাঁকড়া জাতীয় জলচর নিরাপদ আশ্রয় স্বরূপ ব্যবহার করে। বড় জেলি মৎস্যের উক্ত থলিগুলির মধ্যে বহু ক্ষুদ্র জলচর প্রায় বাসা বাঁধে। কেন যে জেলি মৎস্য এই জাতীয় জলচর ভক্ষণ করে না, তাহার কারণ এখনও রহস্যাবৃত।

জেলি মৎস্য এমন ক্ষুদ্রাকারও হয় যে তিন হাজারটি একটি ছোট গেলাসে ধরে; আবার অতি বৃহদাকারও একেবারে বিরল নহে। বোম্বাইয়ের সমুদ্রে একবার একটি জেলি মৎস্য দেখা দেয়, উহার ওজন প্রায় শতাধিক মণ হইবে। আশ্চর্য্য! এত বড় জীবের কোন কঙ্কাল ছিল না। নয় মাসে উহা নানা জলচরের উদরে অদৃশ্য হয়।

কণ্টকচর্ম্ম জীব (Echinoderms)

৪

পঞ্চভুজ (Star Fishes)

জীবধারার প্রথম শাখা

বহু এককোষ জীবাধার মিলিত হইয়া বহুকোষ জীবাধার গড়িয়া তোলার পর হইতেই যে জীবধারা প্রবাহিত হইল, ঐ ধারার প্রথম শাখায় নমুনা স্পঞ্জের মত বহুমুখী জীব (Porifera)। এই জীবাধারে কতকগুলি ছোট বড় গর্ত্ত ব্যতীত আর কোন বিশেষত্ব দেখা দেয় নাই। ঐ জীবাধারে ছোট ছোট ফুটাগুলি মুখ,—ঐ পথে উহা সমুদ্র জলের সহিত আহারাদি গ্রহণ করে। বড় বড় ফুটা দিয়া উহারা অপ্রয়োজনীয় জলাদি দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। গর্ত্তগুলি উহাদের উদর। এই স্থানে আহার্য্য হজম হইয়া দেহের পুষ্টিসাধন করে

জীবধারার দ্বিতীয় শাখা

দ্বিতীয় শাখায় জীবাধারের বহু উদরের স্থানে একটি মাত্র উদর দাঁড়াইয়াছে। এই একোদর জীবাধারের (Coelenterata) প্রকৃষ্ট নমুনা অষ্টভুজ বা জেলি মৎস্য (Jelly Fish)। ইহাদিগকে মৎস্য বলা ভুল। আমাদের মত, মৎস্যেরও মেরুদণ্ড আছে ; অষ্টভুজের জীবাধারে কোন কঙ্কালই জন্মে নাই। এই শাখাভুক্ত আরও দুইটির নাম করা চলে; একটির নাম বহুশীর্ষ (Hydra) ও অপরটির নাম সমুদ্রের ফুল (Sea-anemones); এই দুইটি প্রাণীও সমুদ্রে জন্মে। ইহারা স্থাবর, জঙ্গম নহে। এই শাখায় মুখ, বহু শুঁড়, উদর ও জননেন্দ্রিয় দেখা দিয়াছে।

জীবধারার তৃতীয় শাখা

তৃতীয় শাখায় ক্ষণভঙ্গুর কঙ্কাল দেখা দিয়াছে। এই শাখাভুক্ত জীবাধারকে কণ্টকচর্ম (Echinoderms) বলা চলে। দ্বিতীয় শাখার সর্ব্বোন্নত জীবাধার অষ্টশুণ্ড (Jelly Fish)। এই জীবাধার, মাংসপেশীর সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণ সাহায্যে তালে তালে ঝাঁকানির ফলে, একটা অগ্রগতি লাভ করে। জীবের এই গতি-শক্তি তৃতীয় শাখাভুক্ত জীবাধারে আসিয়া নিয়মিত হইয়াছে।

এই শাখারপ্রকৃষ্ট উদাহরণ পঞ্চশুণ্ড (Cross Fish)। এই শুণ্ডগুলিকে ইহা ইচ্ছামত ঘুরাইতে ফিরাইতে পারিলেও ঠিক পদরূপে ব্যবহার করিতে পারে না। তবে শুঁড়গুলির তলদেশের মাঝখানে একটি করিয়া খাঁজ আছে। এই খাঁজগুলিতে অসংখ্য কোমল ফাঁপা নল জন্মায়। এইগুলি প্রায় এক ইঞ্চি দীর্ঘ। ইহার প্রান্তদেশে একটি খোলার ঝাঁঝরা জন্মায়। শুঁড়গুলির তলদেশের অসংখ্য নলের মুখের ঝাঁঝরা দিয়া পঞ্চশুণ্ড সমুদ্রের জল শুষিয়া লয়। কোমল খোলাবৃত নলগুলি

পঞ্চশুণ্ড—বাম চিত্র—পেটের দিক। দক্ষিণ চিত্র—পিঠের দিক।

জলে ভরিয়া গেলে বেশ শক্ত হয়। তখন ঐগুলি পদরূপে ব্যবহার করিয়া জীবটি সরীসৃপ গতিতে কাঁচের মত মসৃণ মেঝেতেও চলাফেরা করিতে পারে।

আকার

পূর্ণাবয়ব পঞ্চশুণ্ডের শুঁড়গুলি প্রায় ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ হয়। ইহার আকার চেপ্টা ও রং কটা। ইহার প্রধান অঙ্গ ইহার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। উহা দেখিতে চক্রাকার—একটি ডবল পয়সার মত। এই চক্রাকার কেন্দ্রে ইহার উদরটি থাকে এবং ইহার মল-নির্গম পথ থাকে উপরে ও মুখ থাকে নীচে।

ইহার উদর ও মুখবিবর এক। ইহা একটী রবারের থলির মত, প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়াইতে ও কমাইতে পারা যায়। ফলে বালিসের খোলের মত উহার মুখটি উল্টাইয়া কোন দ্রব্য আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে।

এই জলচরকে কলের জলে ধরিবামাত্র মরিয়া যায়। তাহার পর এক সপ্তাহ ধরিয়া কষ্টিক পটাশ পানায় (বিশভাগ জলে একভাগ কষ্টিক পটাশ) ডুবাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে ধুইয়া ফেলিলে দেহের কোমল কঙ্কাল অবশিষ্ট থাকে। উহা দেখিতে ভারি চমৎকার।

পঞ্চশুণ্ডে চক্ষু রূপ লইয়াছে। চক্ষুগুলি শুঁড়ের প্রান্তদেশে অবস্থিত। শুঁড়-গুলির প্রান্তদেশ দেখিতে লাল। এই লাল অংশে চক্ষুগুলি কাঁটায় ঢাকা থাকে, ফলে লাল অংশটুকুই লোকের চোখে পড়ে, উহাদিগের চক্ষুগুলি আর তত দৃষ্টিতে পড়ে না। ইহাদের দন্ত জন্মায় না। কিন্তু ইহাদের গোষ্ঠীভুক্ত সামুদ্রিক কদম্বের (Sea Urchins) দন্ত জন্মিয়াছে।

আহার

ইহারা রাক্ষসের মত খায়। এমন জিনিষ নাই যাহাতে উহাদের অরুচি বোধ হয়। উহাদের আকারের তুলনায় বড় জীবগুলিকেও উহারা ধরিয়া ভাঙিয়া খাইতে পারে। বৃহৎ জীব পেটে পুরিবার জন্ত উহাদের অদ্ভুত উদর বড়ই কার্য্যকর। শুক্তি জাতির জীবের উহা মহাশত্রু। ইহাদের দন্ত না থাকায় চিবাইয়া খাইতে পারে না। জীবটি যদি ক্ষুদ্র হয়, তাহা হইলে উহার উপর ধীরে ধীরে চাপিয়া বসিয়া গোটাটাই পেটে পুরিয়া দেয়। আর যদি জীবটিকে

ঐরূপ ভাবে পেটে পুরিতে না পারা যায়, তাহা হইলে বালিসের খোলের মত উদরটিকে উল্টাইয়া, মুখ দিয়া বাহির করিয়া, জীবটিকে উহা দিয়া আবৃত করে এবং উহাদিগের সুস্বাদু অংশ হজম করিয়া গ্রহণ করে। এইরূপে আহার সম্পন্ন হইলে উদরটিকে পুনরায় উল্টাইয়া পূর্ব্ববৎ করে; তখন পড়িয়া থাকে মাত্র ঝিনুকের খোলাটি। ঝিনুকের মুখ আঁটা থাকিলে পঞ্চশুণ্ডের উদর হইতে আরস রস বাহির হইয়া উহার নিশ্বাস লইবার পথ বন্ধ করিয়া ফেলে, তখন উহা নিশ্বাস লইবার জন্য হাঁ করে; এই অবসরে উহা ঝিনুকের মুখে আপন মুখ প্রবেশ করাইয়া দেয়।

এই শাখাভুক্ত সকল জীবেরই পাঁচটি বিশেষ অঙ্গ দেখা যায়। পঞ্চশুণ্ডের পাঁচটি শুঁড়। সামুদ্রিক কদম্বের তলদেশে পাঁচটি খাঁজ, উহাদের খোলার প্রতি স্তরটি পঞ্চভুজ এবং উহাদের পাঁচটি করিয়া দাঁত জন্মায়।

পঞ্চশুণ্ডের একাধিক শুঁড় নষ্ট হইলে উহা আবার গজায়। অবশ্য জীব জগতে কেঁচো, কাঁকড়া টিকটিকিরও ল্যাজ খসিয়া যাইলে আবার নূতন ল্যাজ গজাইতে দেখা যায়।

চক্রদেহ (Annelids)

ও

কেঁচোর কীর্ত্তি

লোকে বলে কেঁচো। এমন ভাবে উহার কথা বলা হয়, যেন উহার কোন গুণই নাই, সৃষ্টি শৃঙ্খলায় যেন উহার কোন কাজই নাই। প্রকৃতিদেবী তাঁহার এই বিরাট জটিল সৃষ্টি ধাপে ধাপে গড়িয়াছেন; তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যে প্রতি ধাপটি গড়া শেষ না হইলে, অন্যটিতে তিনি হাত দেন নাই। তাঁহার সৃষ্টি-শৃঙ্খলার প্রতি ধাপটিরই অতি প্রয়োজন দেখা যায়।

বিখ্যাত পণ্ডিত চার্লস্ ডারউইনের (Charles Darwin) গবেষণা হইতে এই ঘৃণিত নগণ্য জীব মানুষের কত বড় উপকারী বন্ধু তাহা প্রথম জানিতে পারা যায়। কেঁচোর বিনা সাহায্যে চাষ অধিকতর কষ্টকর হইত। কেঁচো মাটি খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া মাঠের মধ্যে জল, বাতাস প্রবেশ করিবার পথ করিয়া দেয়। মানুষের অদ্ভুত উদ্ভাবনী বুদ্ধি এমন যন্ত্র আবিষ্কার করিতে পারে নাই, যাহার দ্বারা কেঁচোর সাহায্যের অভাব মিটিতে পারে।

কেঁচোর দেহের গঠন

লক্ষ্য করিলে কেঁচোর চলন হইতে উহার দেহের গঠন বুঝিতে পারা যায়। এক পশলা বৃষ্টির পরে মাটির তলায় কেঁচোর বাসাগুলি জলে পূর্ণ হইয়া গেলে কেঁচোগুলি ডুবিয়া মরিবার ভয়ে মাঠে বাহির হইয়া পড়ে। তখন মাঠে লক্ষ্য করিলেই অসংখ্য কেঁচোকে মাঠে চলিতে ফিরিতে দেখা যায়। একটি কেঁচো তুলিয়া লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় উহার সুতার মত নাতিদীর্ঘ দেহ প্রায় দুইশত ক্ষুদ্র চক্র গাঁথিয়া প্রস্তুত। প্রতি চক্রে আটটি লোম থাকে। এই লোমগুলি ভর দিয়াই কেঁচো চলাফেরা করে।

কেঁচোর বাসা

কেঁচো মাটির মধ্যে প্রায় দুই তিন ফুট খুঁড়িয়া গিয়া, উহার মধ্যে বাসা প্রস্তুত করে। মাটি নরম হইলে মাথা দিয়া মাটি ঠেলিয়া আপনার থাকিবার মত নালিপথ প্রস্তুত করে। মাটি শক্ত হইলে, কেঁচো ঐ শক্ত মাটি কুরিয়া কুরিয়া খাইয়া মাটির তলায় নালিপথ প্রস্তুত করে। কেঁচোর পেটে গিয়া শক্ত মাটি গুঁড়া হইয়া কাদায় পরিণত হয় এবং উহা হইতে কেঁচোর পাকস্থলী আপনার খাদ্য গ্রহণ করিবার পর অবশিষ্ট কাদা কেঁচোর নলদেহের অপর মুখ দিয়া বাহির হইয়া যায়। মাঠে এইরূপ সুতা-পাকানো নরম কাদার ছোট ছোট স্তূপ প্রায়ই দেখা যায়। এইরূপ স্তূপের পাশেই কেঁচোর বাসা দেখিতে পাওয়া

যাইবে। এই নরম কাদা খুব ভাল সার। কেঁচোর দেহ হইতে এক প্রকার পাতলা আঠাল পদার্থ বাহির হয়, এই পদার্থ কেঁচো আপনার বাসার প্লাষ্টারের
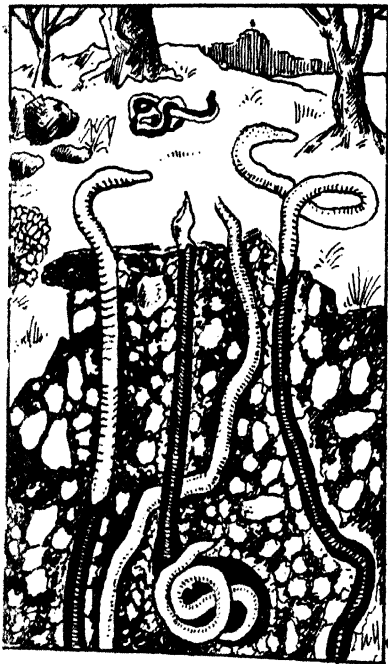
মত মাখাইয়া দেয়, সেই জন্য নালি-পথের গায়ের নরম মাটি ঝরিয়া পড়িয়া বাসা বুজিয়া যায় না।

জীবন যাত্রা

দিনের বেলায় কেঁচো প্রায়ই আপন বাসায় কাটায়। রাত্রে উহা বাসা হইতে বাহির হইয়া দেহের প্রান্তদেশ নালি-পথে রাখে এবং বাসার চারিদিকের পচা উদ্ভিজ্জ পদার্থের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র টুকরাগুলি আপন ক্ষুদ্র বুরুশের মত দেহ দিয়া ঝাঁট দিয়া সংগ্রহ করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কেঁচো ভূমিগর্ভে বহু ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গ কাটিয়া জল ও বাতাস প্রবেশ করিবার পথ করিয়া দেয়। এই অসংখ্য সুড়ঙ্গ পথে চারা গাছের সূক্ষ্ম কোমল মূলগুলি সহজেই প্রবেশ করিয়া আপন খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে। ভূমিগর্ভে এইরূপ সুড়ঙ্গগুলিতে কেঁচো সংগৃহিত পচা উদ্ভিদ-কণাগুলি অতি উত্তম সার। এই সার গ্রহণ করিয়া চারাগুলি বাঁচিবার ও বাড়িবার সুযোগ পায়।

আশ্চর্য্য! ডারউইন কেঁচোর জীবন-যাত্রা লক্ষ্য করিবার জন্য এক টুকরা জমিতে খড়ির গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া ত্রিশ বৎসর অপেক্ষা করেন। তাহার পর জমি খুঁড়িয়া দেখা গেল যে কেঁচো খড়ির প্রতি ক্ষুদ্র টুকরাটিকে ঝাঁট দিয়া লইয়া গিয়া, মাটির প্রায় সাত ইঞ্চি তলায়, খড়ির একটি পাতলা স্তর গড়িয়া তুলিয়াছে।

এইরূপে তিনি বহুবার বহু প্রকারের জিনিষ ছোট ছোট ভূমিখণ্ডে ছড়াইয়া দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে কেঁচো ঐগুলিকে ভূগর্ভে লইয়া গিয়া বিছাইয়া দিয়াছে। দেখা গিয়াছে এক বর্গ হাত ভূমিতে কেঁচো এক বৎসরে অর্দ্ধ সেরের কিছু কম দেহপঙ্ক (Castings) ত্যাগ করে। ইহা জমির অতি উৎকৃষ্ট সার। এই হিসাব মত বৎসরে এক বিঘা জমিতে কেঁচো প্রায় ৬০/ মণ দেহপঙ্ক ত্যাগ করে। মাঠের যে সবুজ শোভা দেখিয়া মন নাচিয়া উঠে, উহার মূলে কিন্তু অদৃশ্যভাবে থাকে কেঁচোর অক্লান্ত পরিশ্রম। নানাভাবে কেঁচো চাষীকে সাহায্য করে। কেঁচো যে নিপুণতার সহিত মাটি ওলট পালট করিয়া দিয়া জল, আলো ও বাতাস প্রবেশ করিবার পথ করিয়া দিয়া চাষের সুবিধা করিয়া দেয়, মানুষের উদ্ভাবিত অদ্ভুত যন্ত্রগুলি উহার নিকট হার মানিতে বাধ্য।

যুক্তপাদ (Arthopods)

ও

কাঁকড়া

বাসা

সমুদ্রের ধারে যে স্থানে পাথরের খাঁজে খাঁজে বেশ বড় বড় দল জম্মে সেইস্থানে প্রচুর ছোট বড় কাঁকড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে, কতকগুলি কাঁকড়া পেটের তলায় ডিমের একটী ছোট তাল বহিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাও চোখে পড়িবে।

ডিম

সরীসৃপ বা পতঙ্গের মত কাঁকড়া ডিম পাড়িয়া অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া যায় না। উহাদিগের পেটের তলায় সাঁতার দিবার জন্য কতকগুলি লোমশ দাঁড়া আছে। ডিম্বকোষ (Oviducts) হইতে ডিমগুলি বাহির হইয়া এই দাঁড়ার লোমে লাগিয়া থাকে। এইরূপ দাঁড়া চিংড়ি মাছে খুব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরূপে ডিমগুলি, ফুটিয়া ছানা না বাহির হওয়া পর্য্যন্ত, মায়ের পেটের তলায় দাঁড়ার গুচ্ছে বাঁধা থাকে। কিছুদিন পরে ডিমগুলি ফুটিয়া যাহা বাহির হয়, তাহা মোটেই কাঁকড়ার মত দেখিতে নয়। ছানাগুলির রূপ দেখিয়া যে জানে না, সে কিছুতেই উহাদিগকে কাঁকড়ার ছানা বলিয়া ধরিতে পারিবে না।

কাঁকড়ার ছানার ক্রমবিকাশ

প্রতি স্ত্রী-কাঁকড়ার পেটের তলায় চারি হাজারের কম ডিম বাঁধা থাকে না। ডিমগুলির রং কমলা এবং আকারে একটি ফুট্‌কির মত। কিছুকাল

১। কাঁকড়ার ডিম ২। সদ্যোজাত কাঁকড়ার ছানা
৩। ১ হইতে ১৫ দিন পর্য্যন্ত বয়স, দমক দিয়া দিয়া জলে সাঁতার দিয়া বেড়ায়
৪। ১৫ হইতে ৩০ দিন বয়স ; চাঞ্চল্য কিছু কমিয়াছে ৫। পূর্ণাঙ্গ কাঁকড়ার ছানা

সাধারণ চিংড়ী মাছ, পেটের তলায় সাঁতার দিবার পা-গুলি দেখা যাইতেছে

পরে ঐগুলির রং গাঢ় ধূসর বর্ণে গিয়া দাঁড়ায়। এই সময়ে ছানাগুলির চক্ষু ফোটে, উহাদিগের আকারের অনুপাতে অতি বৃহৎ চক্ষুগুলির রং স্বচ্ছ খোলার ভিতর দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষুর রং গাঢ় ধূসর বর্ণ বলিয়া মনে হয়, ডিমগুলির রংএর পরিবর্তন হইয়াছে।

তাহার পর ডিমের পাতলা খোলা ছিঁড়িয়া কাঁকড়ার ছানাগুলি বাহির হইয়া পড়ে। তখন তাহাদের আকার অনেকটা কমার (Comma) মত। খোলা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সমুদ্রতটে প্রায় ঘণ্টাখানেকের জন্য উহারা শুইয়া থাকে। তাহার পর উঠিবার চেষ্টা করিতে গিয়া উহারা কয়েকবার গড়াইয়া পড়ে। ক্রমশ: একটু বল লাভ করিলে উহারা আহারের চেষ্টা করে।

তখন ইহাদের শক্ত খোলা জন্মায় না, কুচা চিংড়ির মত এক প্রকার পাতলা স্বচ্ছ আবরণে কোমল দেহটি ঢাকা থাকে। সমুদ্র জলে যে অগণিত জীবকণা ভাসিয়া বেড়ায়, ঐগুলিই তখন উহাদের প্রধান খাদ্য। এই সময় ইহারা একবার খোলস ছাড়িয়া অন্য আকার গ্রহণ করে। তখন ইহাদের নাকের কাছে একটি শিরদাঁড়া দেখা দেয়।

এই অবস্থায় উহারা পনর দিন ধরিয়া লম্ফ ঝম্প করিয়া বিস্তৃত সাগরে সাঁতার দিয়া বেড়ায়। তাহার পর উহারা বহুবার খোলস ছাড়ে এবং প্রতি-বারই একটু করিয়া বাড়ে। এইরূপে বাড়িতে বাড়িতে উহাদের আকার দাঁড়ায় একটি ছোট শূন্যের (০) মত। এইরূপ অবস্থায় কোটী কোটী কাঁকড়ার ছানা লম্ফ দিয়া দিয়া সারা গ্রীষ্মকাল ধরিয়া সমুদ্রে বেড়ায়, খায়, মারামারি করে, বাড়ে এবং প্রতি সামুদ্রিক জীবেরই পেটে গিয়া চিরবিশ্রাম লাভ করে। যে-জীব যত অসহায়, তাহার বংশধারা রক্ষার জন্য প্রকৃতি অজস্র সৃষ্টির ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। ইহারা এত সংখ্যায় জন্মায় যে লক্ষ কোটী জীব খাইয়াও ইহাদের শেষ করিতে পারে না।

যেস্থানে প্রত্যেকেই হাঁ করিয়া আছে খাইবার জন্য, সেস্থানেও প্রকৃতির ব্যবস্থায় বহু কাঁকড়ার ছানাই বাঁচিয়া যায়। তখন তাহারা আবার খোলস

ছাড়িয়া ফেলে। এখন ইহাদের মেরুদণ্ডটি খসিয়া পড়ে, পায়ের গঠনে পরিবর্ত্তন দেখা দেয় ও দাঁড়া জন্মায়। এইরূপ নূতন আকার লাভ করিয়া, উহারা বাড়িবার প্রতিপদে, একবার করিয়া পুরান খোলস ছাড়িয়া ফেলে।

এইরূপে সমুদ্রে সাঁতার দিতে দিতে একটু বড় শূকের মত আকার লাভ করিলে উহাদের সন্তরণ-জীবনের শেষ হয়। তখন উহারা জল হইতে চুণ লইয়া শক্ত খোলা গড়ে এবং আপন লেজ পেটে লাগাইয়া লইয়া ডুবিয়া সমুদ্র তলে গিয়া প্রকৃত কাঁকড়া-জীবন আরম্ভ করে। ইহাই হইল ছোট বড় সকল কাঁকড়ার জীবনের মোটামুটি ইতিহাস।

পূর্ণাঙ্গ কাঁকড়ার জীবন-যাত্রা

কাঁকড়া সমুদ্রতলে পূর্ণাঙ্গ লাভ করিলে, সমুদ্রতল হইতে তীরে উঠিয়া আসে। এই স্থানে উহারা দিনের কয়েক ঘণ্টা, ভাঁটার সময় সমুদ্রজল সরিয়া যাইলে, রৌদ্রতাপ ভোগ করে। ছানা-কাঁকড়া জলচর মাত্রেরই আহার্য্য। সেইজন্য প্রকৃতি-মাতা এই অসহায় ছানাকে বাঁচাইবার জন্য উহারা যে স্থানে থাকে, সেই স্থানের পাথরের মত রং লাভ করিবার ক্ষমতা উহাদিগকে দিয়াছেন। এই কারণে দুইটি কাঁকড়ার রং এক প্রকার দেখিতে হয় না। উহারা যখন অষ্ট পদের উপর ভর দিয়া চলিয়া বেড়ায় তখন উহাদিগকে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন জীব উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে জানিতে পারিলেই উহারা একেবারে স্থির হইয়া যায়, তখন উহাদিগকে চারিদিকের পাথরগুলি হইতে বাছিয়া বাহির করা বড়ই কঠিন। বালুতীরে কাঁকড়ার রং এইজন্য হয় বালুর মত ধূসর বর্ণ। শত্রুর দৃষ্টি বিভ্রম জন্মাইবার জন্য প্রকৃতি-মাতা এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। আজকাল যুদ্ধেও এইরূপ কৌশল অবলম্বন করা হয় (Camouflage)। জলে, স্থলে, আকাশে কাঁকড়া ভক্ষণ করিবার জীবের অভাব নাই, এইরূপ অবস্থায় কেমন সহজে সৃষ্টিধারা রক্ষা করা যায়, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই ক্ষেত্রে মেলে।

এইরূপে অসংখ্য ভক্ষকের মুখ হইতে বাঁচিয়া কাঁকড়ার ছানা যখন ইঞ্চি খানেক বড় হয়, তখন উহারা আপন রং-বেরং-এর খোলস ত্যাগ করিয়া যৌবনের পাকা রং গ্রহণ করে। এখন ইহারা সমুদ্রতীরে বড় বড় পাথরের ফাটলে বা নরম কাঁকরে বাস করিতে আরম্ভ করে।

তাহার পর যৌবনেও ইহার বৃদ্ধি বন্ধ হয় না। কিন্তু খোলা শক্ত হওয়ায়, দেহের বৃদ্ধি অল্প পরিসর স্থানে হইতে থাকায় একদিন পিঠের কাছে লেজের উপর ফাটিয়া গিয়া কোমল চর্ম্মাবৃত কাঁকড়া আপন শক্ত খোলা হইতে পিছলাইয়া বাহির হইয়া পড়ে। খোলার বাঁধন হইতে মুক্তি পাইয়া ইহা অতিশয় ফুলিয়া উঠে। তখন ইহা অতিশয় কোমল-দেহ ও অসহায়। তখন ইহাদিগকে গিলিয়া-ফেলা সকল জীবের পক্ষেই সহজ। এই কারণে ইহারা দশ বার দিন কোন নিরাপদ স্থানে লুকাইয়া থাকে। এই কয়েকদিন ইহা সমুদ্র জল হইতে চুণ সংগ্রহ করিয়া আপনার জন্য একটি শক্ত খোলা গড়িয়া তুলে।

যৌবনের প্রথম বৎসরে দুই তিন বার ইহা পুরাতন খোলস ঐরূপে ছাড়িয়া নূতন খোলস গ্রহণ করে। তাহার পর বৃহত্তম আকার লাভ না করা পর্য্যন্ত বৎসরে একবার মাত্র পুরাতন খোলস ছাড়িয়া নূতন খোলস গ্রহণ করে। কাঁকড়া কতদিন বাঁচে, তাহা সঠিক জানা নাই ; তবে বোধ হয় ইহার আট দশ বৎসর মাত্র আয়ু।

সাধারণতঃ যে কাঁকড়াগুলি আমরা খাই, ঐগুলি আকারে তত বড় হয় না। একবার অষ্ট্রেলিয়ায় একটি কাঁকড়া তারের ঝুড়ির জালে ধরা পড়ে। ইহার সামনের দাঁড়া দু'টির ব্যবধান ছিল প্রায় চারি ফুট। দাঁড়ার কামড়ে কয়েকটি তার ইহা কাটিয়া ফেলিয়া পলাইবার চেষ্টা করে।

আকারের তুলনায় ইহাদের শক্তি অত্যধিক। আক্রান্ত হইলে ইহারা মড়বৎ পড়িয়া থাকে, তাহার পর শত্রুপক্ষ নিশ্চিন্ত হইয়া একটু অসতর্ক হইলে শক্তিশালী দাঁড়া দিয়া তীব্রবেগে আক্রমণ করিয়া এমনভাবে কামড়াইয়া ধরে দাঁড়া না ভাঙ্গিয়া ফেলিলে মুক্তি পাইবার আর কোন উপায় থাকে না।

মরিয়াও যাইবে, কিন্তু কিছুতেই আপন কামড় ছাড়িবে না, ইহাই হইল কাঁকড়ার স্বভাব। ইহার প্রকৃতি রাক্ষসের মত; স্বজাতি ভক্ষণে অরুচি নাই। কয়েকটী ছোট বড় কাঁকড়া একটী চৌবাচ্চায় রাখিয়া দেখা গেল, যে একে একে দুর্ব্বল কাঁকড়াগুলিকে অপেক্ষাকৃত বলশালী কাঁকড়া দাঁড়া দিয়া গুঁড়া করিয়া খাইয়া ফেলিল এবং সর্ব্বশেষে চৌবাচ্চায় পড়িয়া রহিল বৃহত্তমটি।

ডাকাতে কাঁকড়া

ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের মিলন স্থলে এই প্রকার কাঁকড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার দেহে খোলা নাই; কিন্তু পেটের উপর শক্ত চামড়া দিয়া

ডাকাতে-কাঁকড়া নারিকেল গাছে উঠিতেছে

বর্ম্মাবৃত। ইহার ল্যাজ বেশ শক্ত, পেটের তলায় লুকাইয়া লইয়া বেড়াইতে

হয় না; তাহা সত্ত্বেও পূর্ব্ব-পুরুষের সংস্কার বশতঃ ল্যাজটিকে নারিকেলের খোলের মধ্যে বা কোন খালি টিনের পাত্রের মধ্যে ঢুকাইয়া লইয়া বেড়ায়।

কাঁকড়ার ফুসফুস

এই জাতীয় কাঁকড়ার স্থলচর জীবের ফুসফুসের মত বায়ুমণ্ডলের বায়ু গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার উপযুক্ত যন্ত্র জন্মায়। উহার জলচর আত্মীয়গণ কান্‌কোর মত যন্ত্র সাহায্যে জল হইতে বায়ু ছাঁকিয়া গ্রহণ করে। ইহা আকারে বেশ বড় হয় এবং ইহার দাঁড়ায় এত বল যে নারিকেলের মত ফলের ছোবড়া ছাড়াইয়া, খোল ফুটা করিয়া, শাঁস বাহির করিয়া খায়। শাঁস নিঃশেষে খাওয়া হইয়া গেলে দেখা যায় যে, নারিকেলের মালাটিকে আপন ল্যাজের আবরণরূপে ব্যবহার করিয়া বেড়াইতেছে।

বাসা

ডাকাতে কাঁকড়ার দাঁড়ায় এত শক্তি যে উহারা বাগে পাইলে মানুষের হাত নারিকেলের মতই ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে। এইরূপ একটি কাঁকড়াকে অধ্যাপক চার্লস্ ডারউইন্ একটি লৌহ বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখেন, তাহার পর দেখা গেল যে উহা দাঁড়া দিয়া বাক্স ফুটা করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। এই জাতীয় কাঁকড়া গাছের গুঁড়িতে গভীর সুড়ঙ্গ কাটিয়া বাসা করে। ইহারা আপনার বাসায় নারিকেলের ছোবড়া বিছাইয়া রাখে।

এই জলচরের জলে বাস করিবার উপযোগী কানকো, স্থলোপযোগী-ফুসফুসে পরিণত হইতে বহু যুগ লাগিয়া থাকিবে। পূর্ব্বপুরুষের সংস্কারানুযায়ী ইহারা এখনও মাঝে মাঝে জলে গিয়া বাস করে এবং স্ত্রী-কাঁকড়া সমুদ্রতলে গিয়াই ডিম পাড়ে।

জামেকা দ্বীপের কাঁকড়া

জামেকা দ্বীপে (Jamaica Island) একপ্রকার স্থলচর কাঁকড়া সমুদ্র হইতে দুই তিন মাইল দূরে বাস করে। দিনমানে ইহারা পাথরের তলায় বা অন্যান্য আশ্রয়ে লুকাইয়া থাকে এবং রাত্রে আহারের চেষ্টায় বাহির হয়।

বসন্তকালে স্ত্রী ও পুরুষ কাঁকড়াকে যুগলে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার কিছুদিন পরে দেখা যায় উহারা সমুদ্রপানে চলিয়াছে। পেটে ডিম জন্মিলেই উহারা সমুদ্রে ছুটে ডিম পাড়িবার জন্ত। যখন উহাদের সমুদ্রে যাইবার বেগ আসে, তখন কোন বাধাই তাহাদের গতিরোধ করিতে পারে না।

সমুদ্র-যাত্রা

সময় আসিলে উহারা বৃক্ষকোটরাদি আশ্রয় হইতে বাহির হইয়া সম্মুখের বাধা ডিঙ্গাইয়া সমুদ্রে না পৌঁছান পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। দেখিতে দেখিতে বহু কাঁকড়া একই পথে চলিতে থাকায়, উহাদের দল ভারি হইতে থাকে। এমনও দেখা গিয়াছে, একশত হাত চওড়া পথে এক মাইল ধরিয়া কেবলই কাঁকড়ার পাল সমুদ্রের ডাকে ছুটিয়াছে। ইহারা সম্মুখের সরল পথ ধরিয়াই চলে। সারির পুরোভাগ রক্ষা করিয়া চলে বিশালকায় পুরুষ-কাঁকড়াগুলি এবং উহাদের পাছে পাছে চলে অগণিত স্ত্রী-কাঁকড়ার পাল। উহাদের গতি পথে বেড়া, বাড়ী, ছোট পাহাড় বা আর কিছু বাধা পড়িলে উহারা ঐগুলি চড়িয়া পার হইয়া অগ্রসর হইতে থাকে। কোন বাধাই উহাদের সমুদ্রে যাওয়া বন্ধ করিতে পারে না।

জলে ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হইলে এই জাতীয় কাঁকড়ার ছানাগুলি দেখিতে পিতামাতারই মত হয়। বৃদ্ধিকালে পুরাতন খোলা ফেলিবার সময় আসিলে গ্রীষ্মকালে উহারা সমুদ্র হইতে দূরে কোন তরুকোটরে বা পাথরের ফাটলে গিয়া আশ্রয় লয় এবং উহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। এইরূপ নিরাপদ আশ্রয়ে নূতন খোলা দৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত উহারা বাস করে।

শুক্তি-জাতীয় জীব (Molluscs)

৭

ঝিনুক

এই প্রকার জীব দুইটি শক্ত কুঁজো খোলার মধ্যে এক টুকরা চেপ্টা সাদা প্রাণবন্ত পদার্থ আবদ্ধ করিয়া রাখে। খোলা একধারে কব্জার মত আঁটা থাকে, অন্য ধারে উহা খুলিতে পারা যায়। খোলার ভিতর কোন কঙ্কাল জন্মে না, কেবল কোমল প্রাণাধারকে সকলের মুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য দুইটি শক্ত খোলা উহার বহিরাবরণ স্বরূপ গড়িয়া উঠে।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ঝিনুক নাকি মানবের অতি উপাদেয় খাদ্য। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে রোমক জাতি ঝিনুকের রীতিমত চাষ করিত। এখনও ইহার চাষ ইয়োরোপ ও আমেরিকায় রীতিমত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে লক্ষ লক্ষ মণ ঝিনুক সর্ব্বভুক্ মানুষের আহার জোগায়।

ঝিনুক দুই প্রকার আকারের হয়, গোলাকার ও দীর্ঘাকার। উভয়ের ইতিহাসই প্রায় এক। ইয়োরোপে গোলাকার ঝিনুক ও আমেরিকায় দীর্ঘাকার ঝিনুক আহার্য্য রূপে ব্যবহৃত হয়।

ঝিনুকের খোলার একটি পাতলা চামড়া থাকে, এই চামড়া দ্বারাই ঝিনুক সমুদ্রজল হইতে আপনার খোলা গড়িবার জন্য চূণে পাথর গ্রহণ করে। এই চামড়ার তলায় নিঃশ্বাস লইবার দুইজোড়া কানকো আছে এবং এই দুই জোড়া কানকোর মধ্যে ঝিনুকের কোমল দেহ, উদর, অন্ত্র ও জননেন্দ্রিয়টি থাকে। খোলা দুইটীর কব্জার কাছে ইহার হৃৎপিণ্ড ও মূত্রগ্রন্থি দুইটী কয়েকটী কাল দাগের মত দেখিতে পাওয়া যায়। চামড়ার ভিতর দিয়া দেহের মধ্যস্থলে একটী দৃঢ় মাংসপেশী চলিয়া গিয়া ঝিনুকের দুইপাশের দুইমুখে দৃঢ়ভাবে যুক্ত

থাকে। এই মাংসপেশীর সাহায্যে ঝিনুক জোর করিয়া মুখ বন্ধ করিতে পারে।

বংশ রক্ষার উপায়

প্রতি ঝিনুকের, স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জননেন্দ্রিয়ই, থাকিলেও একই সময় কার্য্যকর হয় না। এই কারণে গতিশক্তিহীন পুরুষ ঝিনুকের বীজ সমুদ্র-স্রোতে বাহির হইয়া স্ত্রী-ঝিনুকের ডিমের সহিত মিলিত হইলে ঝিনুক ছানা জন্মগ্রহণ করে। তিন বৎসরে ঝিনুক যৌবন লাভ করে এবং এই বয়সে ঝিনুক ছানা গ্রীষ্মকালে (জুন হইতে সেপ্টেম্বর) জন্মগ্রহণ করে। প্রতি স্ত্রী-ঝিনুকের গর্ভে ২৫।৩০ লক্ষ ডিম জন্মায় এবং এই ডিমগুলি পুরুষ ঝিনুকের বীজের সহিত মিলিত হইলে কোটী কোটী ঝিনুক ছানা জন্মগ্রহণ করে। এই সময়ে ইহারা দুইটী কানকোর মধ্যস্থলে অবস্থিত থলির মধ্যে সাধারণ ছুঁচের ফুটার আকার না পাওয়া পর্য্যন্ত বাড়িতে থাকে। এই শৈশব অবস্থায় ঝিনুক ছানার খোলার বাহিরে সাঁতার দিবার জন্য দুইটী পাখার মত অঙ্গ দেখা দেয়। ঝিনুক মাতৃগর্ভে এইরূপে অঙ্গলাভ করিলে উহাদের গর্ভধারিণী আপন খোলা দুইটীর মুখ মাঝে মাঝে খুলিয়া ও বুজাইয়া প্রতিবারে সহস্র সহস্র ঝিনুক ছানাকে ঠেলিয়া সমুদ্রজলে বাহির করিয়া দেয়। তাহার পর হইতে উহাদের স্বাধীন জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়।

দীর্ঘাকার ঝিনুকের স্ত্রী ও পুরুষের উভয়ের ডিম ও বীজ জলে ভাসিয়া আসিয়া দৈবাৎক্রমে মিলিত হয় এবং নূতন ঝিনুকের জন্ম হয়। পঞ্চভুজ (Star Fish), সামুদ্রিক কদম্ব (Sea-urchins) আদির মত পিতা বা মাতার সহিত ঝিনুকছানার কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক থাকে না। গোলাকার ঝিনুকের বেলায় একটু প্রভেদ দেখা যায়। এই ক্ষেত্রে পুরুষ বীজ ভাসিয়া ভাসিয়া স্ত্রী ঝিনুকের গর্ভে আসিয়া স্ত্রীবীজের সহিত মিলিত হয় এবং মাতার গর্ভেই ছানা জন্ম গ্রহণ করে।

ঝিনুক ছানার জলকেলি

ক্ষুদ্র চঞ্চল ঝিনুকছানাগুলি দমকে দমকে সাঁতার দিয়া বেড়ায়। সঙ্কীর্ণ জলাশয়ে ইহাদের সাঁতার খেলা দেখিবার মত। নিশ্চল মাতার গর্ভে জন্মিলেও এই প্রাণবন্ত কণাগুলির জলকেলি বেশ কৌতুকময়। ইহারা পাঁচে, দশে, বিশে মিলিয়া কখন শৃঙ্খল, মালা, কখন গুচ্ছ, কখন আরও কত কি গড়িয়া তুলে তাহার শেষ নাই। উহারা খেলাচ্ছলে কত রূপ গড়িয়া আবার ভাঙ্গিয়া পড়ে, আবার গড়ে; এইরূপে উহাদের খেলাঘরের ভাঙ্গাগড়া দশ হইতে বিশ দিন ধরিয়া অবিরাম চলিতে থাকে।

ছানার বাড়

এখন ইহাদের আকার এক ইঞ্চির এক শতাংশ দাঁড়াইয়াছে। এইবারে ইহারা সমুদ্রতলে ডুবিয়া গিয়া কোন করকরে পাথুরে পদার্থের উপর বসে। তাহার পর সামান্য চূণের জল-পূর্ণ রস বাহির করিয়া উক্ত করকরে পদার্থে আপনাকে শক্ত করিয়া আঁটিয়া দেয়। যেগুলি সমুদ্রতলে কাদা বা নরম তলানির উপর গিয়া পড়ে সেগুলি চাপা পড়িয়া মারা যায়।

এইরূপে কোন শুক্ত পদার্থের উপর আপনাকে আঁটিয়া লইবার পর উহারা আর নড়ে না, ঐ স্থানেই দিনে দিনে বাড়িতে থাকে এবং যৌবন প্রাপ্ত হইলে আর এক পুরুষের ঝিনুকের সৃষ্টি করে।

সমুদ্রের স্রোতে অসংখ্য জীবকণা ভাসিয়া বেড়ায়, এইগুলি জলের স্রোতে উহাদের মুখে প্রবেশ করায় উহারা স্থানান্তরে না গিয়াও প্রচুর আহার্য্য পায়। ঝিনুকের মুখ দিয়া জীবকণাগুলি উহাদের উদরে প্রবেশ করিলে অপ্রয়োজনীয় জল, মলাদি উহা অন্য এক পথে বাহির করিয়া দেয়। এই পথটিকে ঝিনুকের মলনালী বলা চলে।

জীব একাধারে খাদ্য ও খাদক

ঝিনুকের জন্ম-কথায় দেখা যায় কোটি কোটি ঝিনুক-ডিম জন্মিলেও, বাঁচে অতি অল্পই। নানা জীবের ধারা বজায় রাখিবার জন্য প্রচুর খাদ্যের প্রয়োজন।

নানা জীব নানা জীবকেই খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে। প্রতি জীবটিই একের খাদক ও অপরের খাদ্য। এই অদ্ভুত শৃঙ্খলার প্রতি জীবধারাটি বজায় রাখিতে হইলে, প্রাণী যতই অসহায় হইবে উহার জন্ম ততই অধিক সংখ্যায় হওয়াই উচিত। তাহা না হইলে অপেক্ষাকৃত বলশালী জীব দুর্ব্বল জীবকে খাইয়াই শেষ করিয়া ফেলিবে। ফলে জীবধারা শুখাইয়া যাইবে। ঝিনুকের ধারায় দেখা যায় লক্ষে একটি মাত্র বাঁচে কিনা সন্দেহ। সামুদ্রিক জীবের যাহারই মুখ আছে, উহাই ঝিনুকের ছানা খাইয়া আনন্দ পায়, তথাপি ঝিনুকের অভাব এপর্য্যন্ত দেখা যায় নাই।

ঝিনুকের ছানা কোন শক্ত পদার্থে আপনাকে আটকাইয়া একটা আবাস লাভ করিলেও, উহাদের বিপদের শেষ হয় না। এক বৎসরে নূতন আশ্রয়ে আমাদের পয়সার আকার লাভ করিলে ঝিনুকের নূতন নূতন ভক্ষকেরা দলে দলে দেখা দেয়।

তখনও উহাদের খোলা অতি পাতলা থাকে। আমরা যেরূপ বিস্কুটের স্যাণ্ডউইচ (Sandwich) কামড়াইয়া খাই, কাঁকড়ার দল আসিয়া ঐরূপ কিশোর-ঝিনুক একটু একটু করিয়া কামড়াইয়া খাইয়া ফেলে। শুক্তিধারাভুক্ত নানা তীক্ষ্ণদন্ত জীব ঝিনুকের পাতলা খোলা ফুটা করিয়া ফেলে এবং একটি ফাঁপা সরু নল প্রবেশ করাইয়া দিয়া ঝিনুকের কোমল মাংস ঐ নল দিয়া শুষিয়া লয়। পঞ্চশুণ্ডের দল পাথরের টুকরার সহিত গোটা গোটা ঝিনুকের ছানা গিলিয়া ফেলে। এইরূপে স্থাবর ঝিনুকের প্রায় দশ ভাগের নয় ভাগ অপরের উদরে গিয়া আশ্রয় লাভ করে।

এইরূপ নানা বিপদ কাটাইয়া যাহারা বাঁচিয়া যায়, তিন বৎসর পরে তাহাদের আকার বেশ বড় হয়। এখন ইহাদের শত্রু সংখ্যাও কমিয়া আসে। এই সময় সর্ব্বভুক মানবের কৃপাদৃষ্টি উহার উপর পড়ে। সে সমুদ্রতল যন্ত্র সাহায্যে চাঁচিয়া বড় বড় ঝিনুককে উপরে তুলে। তাহার হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই।

———

উভচর (Amphibia)

৮

ব্যাঙ ও ব্যাঙাচি

ব্যাঙের দ্বিজত্ব

ব্যাঙ প্রকৃতই দ্বিজ। এক জন্মে সত্যই ইহার দুইবার জন্ম হয়। প্রায় হাজার রকমের ব্যাঙ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক দুই শতের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের দেশে নানা আকারের ব্যাঙ দেখিতে পাওয়া যায়। এক দেড় ইঞ্চি দীর্ঘ ক্ষুদে ব্যাঙ হইতে আরম্ভ করিয়া আড়াই তিন সের ওজনের জাট ব্যাঙ (bull-frog) পর্য্যন্ত, পৃথিবীর সকল ব্যাঙের নমুনাই আমাদের দেশে পাওয়া যায়। ইয়োরোপে এক প্রকার ব্যাঙ খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এই জাতীয় ব্যাঙের পিছনের পা দু'টি খাইতে নাকি অতি সুস্বাদু।

এই জীবাধারে মৈথুনি সৃষ্টির প্রথম উন্মেষ

মার্চ্চ বা এপ্রিল মাসে স্ত্রী ব্যাঙ জলে অসংখ্য ডিম পাড়ে। ডিম পাড়িবার সময় স্ত্রী ব্যাঙকে পুরুষ ব্যাঙ জড়াইয়া থাকে এবং ডিম সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ ব্যাঙের বীজে প্রাণবন্ত হইয়া জলে পড়ে। ঐরূপে ডিমগুলি প্রাণবন্ত হইবামাত্র উহার বৃদ্ধি আরম্ভ হয়। জলে পড়িয়া উহারা একতাল জেলির মত জলাশয়ের তলায় গিয়া জমা হয়। ব্যাঙের জীবনেই বোধ হয় প্রথম মৈথুনি সৃষ্টির আরম্ভ।

শীতের দীর্ঘ নিদ্রাভঙ্গের পর বর্ষাগমের পূর্ব্বেই ভেককুল জাগিয়া উঠিলে উহারা নিকটস্থ খানা, পুকুর আদি জলাশয়ে গিয়া সশব্দে মিলিত হয়। মিলন কালে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষই বেশী চীৎকার করে। এই মিলনের ফলে স্ত্রী-ব্যাঙ দুই এক হাজার ডিম পাড়ে।

ব্যাঙের ডিমের ক্রমবিকাশ

টাটকা-পাড়া ডিম আকারে প্রায় এক ইঞ্চির এক ষোড়শাংশ। জলে পড়িয়া শীঘ্রই প্রচুর পরিমাণে জল শুষিয়া ইহার তিন গুণ আকার লাভ করে।
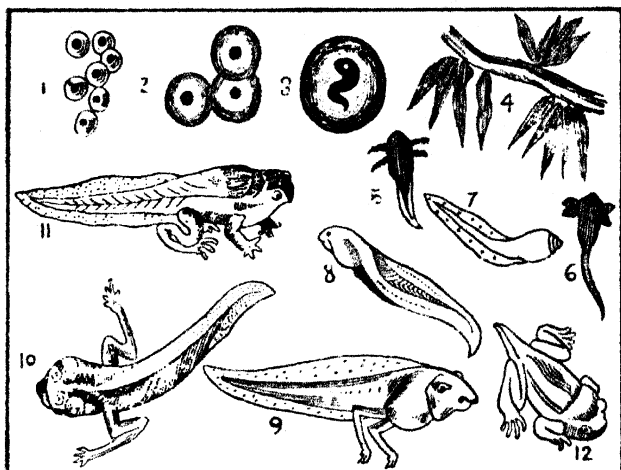
১। সদ্য পাড়া ডিম ২। কিছুক্ষণ পরের আকার ৩। ডিম ফুটিয়া ব্যাঙাচি বাহির হইবার ঠিক পূর্ব্বের অবস্থা ৪। সদ্য ডিম হইতে বাহিরে-আসা ব্যাঙাচি ৫। ও ৬। কানকো শুদ্ধ ব্যাঙাচির রূপ ৭। ও ৮। কান্‌কো বাঁচাইবার চর্ম্মযুক্ত ব্যাঙাচি ৯। ও ১০। ব্যাঙাচির পিছনের পা গজাইয়াছে ১১। ব্যাঙাচির কান্‌কোর বর্ম্ম হইতে সম্মুখের পা বাহির হইয়াছে ১২। শিশু-ব্যাঙের ল্যাজটি প্রায় আত্মগোপন করিয়াছে

ডিমের মধ্যে জীবের দিনে দিনে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। অতি ক্ষুদ্র দানার উপর জেলির একটা পাতলা আবরণ—এই হইল ডিমের আদি অবস্থা।

তাহার পর জল গ্রহণ করিয়া আকার তিন গুণ হইলে উহা লঘু হইয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠে। একটি ডিমকে অণুবীক্ষণ সাহায্যে বড় করিয়া দেখিলে উহার দুইটি অংশ চোখে পড়ে। কাল অংশের উপর একটি সাদা আবরণ। এই সাদা আবরণের মধ্যে ভ্রূণের খাদ্য থাকে। কাল অংশ ফুটিয়াই ব্যাঙাচি জন্মায়।

ব্যাঙাচিগুলির মুখ না হওয়া পর্য্যন্ত উহারা ডিমের সাদা অংশ খাইয়া বাঁচিয়া থাকে ও বাড়ে। কিছুদিন পরে ডিম আর গোলাকাররূপে বাড়ে না, তখন লক্ষ্য করিলে ভবিষ্যৎ ব্যাঙাচির মাথা ও মেরুদণ্ডের আকার ডিমের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর একটি ল্যাজ গজায়। এখন ইহাকে দেখিতে হয় একটি ক্ষুদে মাছের মত। ক্রমশঃ বহির্দ্দেশে কানকো দেখা দেয়। এই অবস্থায় ডিম জন্মিবার প্রায় এক পক্ষ পরে ডিমের কোমল আবরণ ভাঙ্গিয়া ভ্রূণ মৎস্যাকার ব্যাঙাচি জলের জীবন আরম্ভ করে।

ব্যাঙাচি প্রথম প্রথম পুকুরের তলদেশে কোমল শেওলা খাইয়া খুব শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। শীঘ্রই ল্যাজের মূলদেশের নিকটে কয়েকটি স্থান ফুলিয়া উঠিয়া ক্রমশঃ অঙ্গাদিতে পরিণত হইতে থাকে। এইগুলি যুক্ত হইয়া পায়ের আঙুলে পরিণত হয়। ইতি মধ্যে সম্মুখের পা দুটিও দেখা দিয়াছে। কিন্তু এই দুইটি আবরণে আবৃত থাকায় কিছুকাল দেখিতে পাওয়া যায় না। এই আবরণের মধ্যে কানকোগুলিও মোড়া থাকে।

দুই মাসে ফুসফুস্ দেখা দেয়, তখন কানকো ও তাহার আবরণ মিলাইয়া যায়। এই সময় ল্যাজটিও ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতে আরম্ভ হয়। তাহার পর ক্ষুদ্র ব্যাঙটি জল হইতে ডাঙ্গায় উঠিয়া নিশ্বাস লইতে আরম্ভ করে এবং মাটিতে চলা অভ্যাস করে।

গেছো ব্যাঙ

এক জাতীয় ব্যাঙ গাছে বাস করে। উহারা কয়েকটি পাতা জুড়িয়া পাখীর একটি কুলার মত গড়ে। এইরূপ পত্রনীড়গুলি জলাশয়ের উপর গাছ হইতে

ঝুলিতে দেখা যায়। এই জাতীয় ব্যাঙ ঐ নীড়ে ডিম পাড়ে এবং ডিমগুলি হইতে ব্যাঙাচি বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ পত্রনীড়েই উহারা বড় হয়। তাহার পর ডিম ফুটিয়া ব্যাঙাচি জন্মিলে উহারা পত্রনীড় হইতে জলে লাফাইয়া পড়ে।

সাধারণ ব্যাঙগুলি জলের ধারে বাস করে এবং প্রায়ই জলে লাফাইয়া পড়িতে দেখা যায়। কোলা ব্যাঙ কিন্তু গৃহস্থের ঘরে বা বাগানে বাস করে এবং পোকা মাকড় ও মাছি খাইয়া প্রকারান্তরে গৃহস্থের উপকারই করে।

এই জাতীয় জীব জলচরের নিশ্বাস লইবার উপায়স্বরূপ কান্‌কো লইয়া জন্মিলেও, কিছুদিন পরে স্থলচরের উপযোগী ফুস্‌ফুস্‌ ও চতুষ্পদ লাভ করে। এক জন্মে দুই জন্ম প্রকৃত পক্ষে ব্যাঙেরই দেখিতে পাওয়া যায়।

৯

পিপীলিকা

পিপীলিকা দেখিতে ক্ষুদ্র, কিন্তু বুদ্ধিতে মনে হয় মানুষের পরেই উহার স্থান। গত দেড়শত বৎসর ধরিয়া ইয়োরোপে উহাদিগের জীবনযাত্রা প্রণালী লইয়া যে পর্য্যবেক্ষণ, আলোচনা ও গবেষণা চলিতেছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় পণ্ডিতেরা উহাদিগকে হেয় বা অবজ্ঞেয় মনে করেন না।

পিপীলিকার দেহের গঠন

পণ্ডিতেরা পিপীলিকাকে মৌমাছি ও বোল্‌তার সহিত সমশ্রেণীভুক্ত বলেন। তবে মাত্র কয়েক জাতীয় পিপীলিকারই "হুল্‌" পূর্ণাকারে বিকশিত হইয়াছে, কিন্তু উহারা সাধারণতঃ উহা ব্যবহার করে না। উহাদিগের চোয়াল দুটী

বড়ই ধারাল, আক্রমণের সময় উহারা কাঁচির মতন চোয়াল দুইটী চাপিয়া নরম মাংস ছিঁড়িয়া ফেলে।

পিপীলিকার দেহে শব্দ করিবার যন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়াছে। ইহাদিগের কোন কোন জাতির মধ্যে এই যন্ত্রের উন্নতি দেখা যায়। এই শব্দ উহারা উহাদিগের দেহের একটী ধারাল অঙ্গ সম্মুখস্থ আর একটী অঙ্গের উপর ঘষিয়া উৎপন্ন করে। এই শব্দ দশ পনের হাত হইতে বেশ শুনিতে পাওয়া যায়।

এ পর্য্যন্ত প্রায় দুই হাজার জাতীয় পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। যে দেশেই উহারা জন্মগ্রহণ করুক না কেন, উহাদিগের সকলের মধ্যে অল্পাধিক বুদ্ধির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। জীবকুলের উন্নত জাতিগুলিরই মধ্যেই অল্পাধিক বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু বুদ্ধির বিকাশে মানুষের পরেই পিপীলিকার স্থান।

সংঘজীবন পিপীলিকার বুদ্ধির কারণ

আমাদের ধারণা যে মস্তিষ্কই বুদ্ধির উৎপত্তি স্থান। পিপীলিকার মস্তিষ্ক খুঁজিতে হইলে শক্তিশালী অণুবীক্ষণের প্রয়োজন হয়। এত অল্প মস্তিষ্কে ঐরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পীঠ দেখিয়া আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। এই ক্ষুদ্র জীবের মধ্যে অপূর্ব্ব বুদ্ধি বিকাশের দুই একটী কারণ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। পোকামাকড়গুলির প্রায় সকলগুলিই যৌবন লাভ করিবার কিছুদিন পরেই মারা পড়ে; মাত্র দুটী একটীকে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিয়া আর কিছু-দিন বাঁচিয়া থাকিতে দেখা যায়।

কিন্তু পিপীলিকার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অন্য প্রকার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। শিখিবার তিনটী উপায় সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়; শুনিয়া, দেখিয়া ও ঠেকিয়া। প্রথমতঃ উহারা সংখ্যায় বহু এক সঙ্গে বাস করিয়া এক একটী পৃথক সমাজ গড়িয়া তুলে। এই কারণে একে অপরের দেখিয়া শিখিবার সর্ব্বদাই বহু সুযোগ পায়। দ্বিতীয়তঃ উহারা আট বৎসর পর্য্যন্তও বাঁচে,

ফলে ঠেকিয়া শিখিবারও বহু সুযোগ পায়। এইরূপেই মানুষের মনে প্রথমে বুদ্ধি জাগিয়াছিল। কিন্তু জন্মিয়া বড় হইবার পরই আপন আপন কাজে লাগিয়া যায় কি করিয়া; মায়ের ভাষা বুঝিতে পারে নাকি?

বংশধারা রক্ষার বিধি

বসন্তকালের শেষে বহু পিপীলিকা অণ্ড হইতে জন্মগ্রহণ করে এবং তাহার কিছুদিন পরেই "পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে।" তাহার পর ঝাঁকে ঝাঁকে পিপীলিকারা আকাশে উড়িতে আরম্ভ করে। উড়িবার সময় ইহারা জোড়ায় জোড়ায় উড়ে। বসন্তকালই জীব-সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল। প্রকৃতির ইঙ্গিতে জীবধারা বজায় রাখিবার জন্য এই কালে পুরুষ ও স্ত্রী পিপীলিকারা যুগল মিলনে মহানন্দে মাতিয়া আকাশে উড়িতে থাকে।

এইরূপে আকাশে বিবাহ উৎসব শেষে পাখী, টিকটিকি ইত্যাদির কবল হইতে যাহারা ভাগ্যবশে বাঁচিল, তাহারা অতি ক্লান্ত হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। তখন দেখা যায় অধিকাংশ পুরুষেরাই অবসাদ ও ক্লান্তিতে মারা গিয়াছে এবং ডিমভরা স্ত্রী-পিপীলিকারা তখন ডিম পাড়িবার জন্য নির্জ্জন ও নিরাপদ বাসা খুঁজিতে খুব ব্যস্ত হইয়াছে।

যে-নারী নিরাপদ বাসা খুঁজিয়া পাইয়া নিশ্চিন্ত হইল, সে ভূনিম্নে বাস করিবার জন্য উদ্যোগ আরম্ভ করে। তাহার পাখা দু'টী ক্রমশঃ খসিয়া পড়ে। তাহার পর সে নিজে বাস করিবার জন্য ভূনিম্নে মাটী কাটিয়া একটি ঘর প্রস্তুত করে এবং এই ঘরে অসংখ্য ডিম পাড়ে। এই ডিমগুলি হইতে ফুটিয়া বাহির হয় অসংখ্য পক্ষহীন শ্রমিক পিপীলিকা। অসহায় কীটাবস্থায় এইগুলিকে গর্ভধারিণী পিপীলিকাই খাওয়ায় ও দেখাশুনা করে। এই সন্তানগুলি বড় হইয়া গেলে গর্ভধারিণীকে অসংখ্য ডিম পাড়া ছাড়া আর কিছুই করিতে হয় না। পরিবারের সকল কাজই এই প্রথমজাত শ্রমিক সন্তানগুলিই করে।

পিপীলিকা কীটগুলি পূর্ণাঙ্গ লাভ করিলে আপনাদিগের আচ্ছাদনস্বরূপ এক একটী গুটী বুনিয়া লয়। মাছ ধরিবার জন্য বাজারে যে পিপীলিকার ডিম বিক্রয়

হয়, উহা এই গুটীগুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রায় তিন মাসে গুটী কাটিয়া পিপীলিকাগুলি বাহির হয়। এখন উহারা পূর্ণাঙ্গ পিপীলিকা। গুটী কাটিয়া বাহির
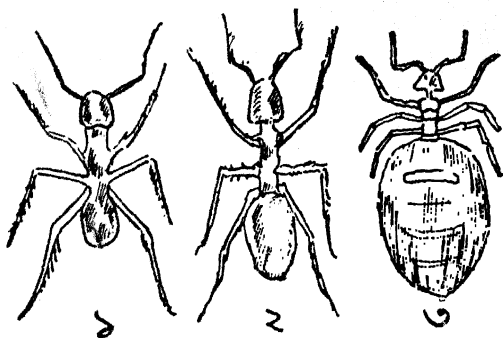
১। সাধারণ পিঁপড়ে ২। কাঠ পিঁপড়ে ৩। ডেয়ো পিঁপড়ে

হইবার সময় উহাদের গায়ে একটি খোলস থাকে। প্রত্যেকে আপন খোলসটী অপরের সাহায্যে খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া সমাজের নানা কাজে লাগিয়া পড়ে।

বাস করিবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর, পথ, আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি শত কাজে তাহাদিগকে ব্যস্ত দেখা যায়। এক সেকেণ্ডও বিশ্রামের সময় নাই। নিজেরা বাস করিবে, আবার গর্ভধারিণী পিপীলিকারও ডিম হইতে ভবিষ্যতে শত সহস্র নূতন পিপীলিকা জন্ম গ্রহণ করিলে উহাদিগের ব্যবস্থাও করিতে হইবে; অতএব কাজের আর শেষ নাই।

গর্ভধারিণী পিপীলিকা ক্রমে ক্রমে যেমন শত সহস্র ডিম পাড়িতে থাকে, শ্রমিক পিপীলিকাদিগের কাজও বাড়িয়া চলে। পিপীলিকা-পুরীর সংস্কার প্রয়োজন, নবাগতদিগের বাসের জন্য নূতন কক্ষ করিতে হয় ও পুরাতনের সংস্কার করিতে হয়। শস্যাগার বড় করিতে হয় ও উহাতে অধিকতর শস্য সঞ্চয়ের চেষ্টা করিতে হয়। কীটগুলিকে সযত্নে রক্ষা করিতে হয় এবং মুখে

মুখে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। গর্ভধারিণী পিপীলিকাটিকেও এইরূপে নানা যত্নে রাখিতে হয় ও খাওয়াইয়া দিতে হয়। এই গর্ভধারিণী পিপীলিকা ও উহার দুই একটি পুরুষ সহচর ব্যতীত আর সকলেই খুব ব্যস্ত থাকে।

গর্ভধারিণী পিপীলিকার জীবন-যাত্রা

একটি বড় ঘরে গর্ভধারিণী পিপীলিকাটি শুইয়া থাকে, কোনদিন ঐ ঘর হইতে বাহির হয় না। খাস অনুচরেরা খাদ্য লইয়া আসে এবং খাওয়াইয়া দেয়। উহারা উক্ত সংঘ-মাতাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দিয়া তাহার ঘরটি মার্জ্জনা করে। গর্ভধারিণী ডিম পাড়িলে, অনুচরেরা ঐগুলিকে ফুটাইবার ঘরের মুখে রাখিয়া যায়।

ডিমগুলি ফুটিয়া শিশু-পিপীলিকা বাহির হইলে, তখন অন্য জাতীয় কীটের মত নিজেরা খাইতে পারে না, উহাদিগকে খাওয়াইয়া দিতে হয়। এই কার্য্যের জন্য বহু ধাত্রী পিপীলিকা নিযুক্ত হয়। ইহারা নিজেরা খাইয়া ঐ অন্ন হজম করিবার পর আবার মুখে আনিয়া শিশুদিগের মুখে ঐ ভুক্ত-অন্ন তুলিয়া দেয়।

এই শিশুগুলির শুদ্ধ বায়ু প্রয়োজন হয়, এইজন্য ধাত্রীগণ উহাদিগকে মুখে করিয়া লইয়া ভূগর্ভ পিপীলিকা-পুরীর অলিন্দে মাঝে মাঝে প্রয়োজনমত ঘুরিয়া বেড়ায়। গুটি অবস্থায় খাওয়াইবার প্রয়োজন না থাকিলেও উহাদিগের সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। উহাদিগের কক্ষ অধিক স্যাঁতসেঁতে বোধ হইলে গুটিগুলিকে অন্য কোন শুষ্ক কক্ষে সরাইয়া রাখিতে হয়।

গুটি কাটিয়া ক্ষুদ্রাকার পিপীলিকাগুলি বাহির হইলে, ধাত্রীগণ উহাদিগের খোলসগুলি ছিঁড়িয়া দিলে উহারা পুরীর কাজে লাগিয়া পড়ে। এই ধাত্রী পিপীলিকাগুলির সতর্ক দৃষ্টি ও সযত্ন সেবা মানবধাত্রী অপেক্ষা কম নয়।

পিপীলিকাগুলির প্রথম লক্ষ্য শিশুর মঙ্গলের প্রতি। কোন পিপীলিকা-পুরী হঠাৎ যদি আক্রান্ত হয়; কোন পিপীলিকার বাসা যদি খুঁড়িয়া ফেলা

হয়, ঐরূপ ধ্বংসের মধ্যেও বিষম ভয়াক্রান্ত শ্রমিক পিপীলিকা কর্ত্তব্য ভুলে না। এই সময় প্রত্যেকেই মুখে ডিম বা গুটি লইয়া, উহার একটি নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছুটাছুটি করে।

এই বিপদের সময় পিপীলিকারা প্রত্যেকেই "যঃ পলায়তে স জীবতে" বা "আপনি বাঁচলে বাপের নাম" এইভাবে ছুটাছুটি করে না। উহাদিগের তখন একমাত্র চেষ্টা থাকে ভবিষ্যৎ বংশীয়দিগকে রক্ষা করা। এই মাতৃ-ভাবের বিকাশ ঐ ক্ষুদ্র নগণ্য পিপীলিকাদিগের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের প্রত্যেকের মধ্যে সমাজের মঙ্গলেচ্ছা এতই প্রবল ও বাস্তব যে উহার নিকটে মানুষের সমাজতন্ত্রবাদের মত বড় বড় কথা ছেলেখেলা বলিয়া বোধ হয়।

এইরূপ স্বভাবের জন্য, লুণ্ঠিত ডিমজাত পিপীলিকাগুলি জা[illegible]ও পারে না উহাদিগকে ধরিয়া আনা হইয়াছে। উহারা পূর্ণাঙ্গ লাভ করিবামাত্র [illegible] সকলের সহিত অতি স্বাভাবিক ভাবেই সন্তুষ্টমনে পুরীর নানাকাজে লাগিয়া পড়ে। কোন কোন পিপীলিকাদিগের মধ্যে এই 'বেগার' দিয়া কাজ করাইয়া লওয়ার প্রথা এত প্রচলিত যে উহারা লুণ্ঠিত ডিমজাত পিপীলিকা দিয়া পুরীর সকল কাজই করাইয়া লয়, নিজেরা কেবল 'উপরওলা' সাজিয়া বেড়ায়।

এইরূপ অন্য পুরীর ডিম লুণ্ঠন অনায়াসেই চলে না। আক্রান্ত ও আক্রমণ-কারীদিগের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধশেষে উভয় পক্ষের হত[illegible]ের ছিন্ন ভিন্ন দেহগুলি আক্রান্ত পুরীর চারিদিকে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। আক্রান্ত-পুরীবাসী পিপীলিকারা প্রাণ দিয়াও মূল্যবান ডিমগুলি বাঁচাইবার চেষ্টার ত্রুটি করে না।

ডাকাতে পিপীলিকা

পিপীলিকা সমাজের মধ্যে চোর ডাকাতেরও অভাব নাই। ইহারা দেখিতে অনেকটা, যাহারা দাস দিয়া কাজ করায়, তাহাদের মত। ছোট ছোট কাল

পিপীলিকা, এই চোর ডাকাতের দল, মনে করে খাটিয়া খাওয়া ভুল,—মস্ত বোকামি।

কোন বৃহদাকার জাতীয় পিপীলিকার পুরীর নিকটেই ইহারা বাসা বাঁধে। তাহার পর মাটির মধ্যে সরু সুড়ঙ্গ কাটিয়া ঐ পুরীর ভাঁড়ারে গিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা দিনের পর দিন পরের সঞ্চিত দ্রব্য চুরি করিয়া ধরা না পড়া পর্য্যন্ত আহার করিয়া দিন কাটায়। অবশ্য ধরা পড়িলে একেবারে জঙ্গী আইন,—দয়ামায়ার কোন বালাই নাই। মজার কথা—ঐ সরু সুড়ঙ্গ পথে বৃহদাকার পিপীলিকাগুলি চোরের দলকে [illegible] করিতে না পারায় উহাদিগের চুরি সহজে বন্ধ হয় না।

পিপীলিকাদিগের মধ্যে দয়াবৃত্তি

পিপীলিকাদিগের মধ্যে দয়ামায়ারও অভাব [illegible] একজন পিপীলিকা-বিদ্ একবার একটি অদ্ভুত পরীক্ষা করেন। তিনি [illegible] কয়েকটি পিপীলিকাকে একটি বাক্সে বন্ধ রাখেন। তাহার পর উহারা ক্ষুধার্ত্ত হইলে, একটিকে বাহির করিয়া লইয়া প্রচুর খাদ্যের সম্মুখে ছাড়িয়া দেন। ঐ খাদ্য তিনি নীল দিয়া সামান্য রং করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐ পিপীলিকাটির খাওয়া হইয়া গেলে উহাকে আবার বাক্সে ক্ষুধার্ত্তদের সঙ্গে রাখিয়া ছিলেন।

ক্ষুধার্ত্ত পিপীলিকাগুলি তৃপ্ত পিপীলিকাটির নিকটে আসিয়া উহার শুঁড় স্পর্শ করিয়া পেটের ক্ষুধার কথা জানাইতে লাগি[illegible]। দেখা গিয়াছে যখনই কোন প্রকার সাহায্যের প্রয়োজন কাহারও হয়, সে তখনই আসিয়া কোন পিপীলিকার শুঁড় স্পর্শ করিয়া জানায়। পিপীলিকারা শুঁড় স্পর্শ করিয়াই মনোভাব জানায়।

শুঁড় স্পর্শের পর দেখা গেল, তৃপ্ত পিপীলিকাটি সামান্য খাদ্য পেট হইতে মুখে তুলিয়া ক্ষুধার্ত্তটির মুখে দিল। এইরূপে ক্ষুধার্ত্ত কয়টি পিপীলিকাই একে একে সামান্য আহার লাভ করিল। প্রত্যেক পিপীলিকার পেটেই নীল রং

পাওয়ায় প্রমাণিত হয় ক্ষুধার্ত্ত প্রত্যেকেই তৃপ্ত পিপীলিকাটির নিকট হইতে খাদ্য পাইয়াছিল।

চাষী পিপীলিকা

অন্দরে এই ব্যস্ততা, সদরেও অনুরূপ ব্যস্ততা চোখে পড়ে। কতকগুলি পিপীলিকা চাষী। উহারা সমাজের জন্য শস্য জন্মায়। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার, না দেখিলে বিশ্বাস করা শক্ত।

কখন কখন উহাদিগকে সুদীর্ঘ সারিতে মুখে করিয়া এক টুকরা পাতা লইয়া যাইতে দেখা যায়। এই পাতাকাটা-পিপীলিকা গোল করিয়া অতি ক্ষুদ্র পাতার টুকরা মুখে করিয়া বাসায় লইয়া গিয়া একটি গাদায় জমা করে। এই পাতার গাদা পচিয়া উঠিলে উহাতে এক প্রকার ক্ষুদ্র ব্যাঙের ছাতা জন্মায়। এইগুলি পিপীলিকাদিগের অতি প্রিয় আহার। এইরূপে উহারা পিপীলিকা-পুরীতেই নিজেদের আহার্য্য উৎপন্ন করিয়া লয়।

বাহিরের মাঠে পাতা পচিয়া ঐরূপ ব্যাঙের ছাতা জন্মায় বটে কিন্তু ঐগুলি সযত্নে চাষ করার মত এত সুন্দর হয় না। আর এক জাতীয় চাষী-পিপীলিকা সার ও পচা কাঠের টুকরা মুখে করিয়া একটি গাদায় জমা করে। এই গাদা পচিয়া উঠিলে এক রকমের "ব্যাঙের ছাতা" জন্মায়।

এক শ্রেণীর পিপীলিকা ঘাসের অতি ক্ষুদ্র বীজগুলি মুখে করিয়া আনিয়া সঞ্চয় করে। পুরীতে স্থান অল্প, অতএব এলোমেলো ভাবে খাদ্য রাখিলে চলে না। মাঠ হইতে ঐরূপ নীবার (ঘাস) ধান্য মুখে করিয়া আনিয়া প্রথমে উহারা বাসার বাহিরে জমা করে। তাহার পর একদল শ্রমিককে ঐগুলি ছাড়াইয়া বীজ বাহির করিতে ব্যস্ত দেখা যায়। কোন কোন পিপীলিকার বাসার নিকটে ঐরূপ ছাড়ান তুষের গাদা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই ছাড়ান বীজ সংগ্রহ করিয়া ভাঁড়ারে সযত্নে রাখা হয় এবং পাছে স্যাঁতসেঁতে ভূগর্ভের আলো বাতাসহীন কক্ষে রাখায় ঐ চাউল নষ্ট হয়, সেইজন্য মাঝে

যায়ে ঐগুলিকে মুখে করিয়া আনিয়া রৌদ্র ও বাতাসে শুকাইয়া তোলা হয়। এইজন্য উহারা বাসার নিকটে এক টুকরা জমি পরিষ্কার করিয়া রাখে।

পিপীলিকাদিগের মধ্যে দাস-প্রথা

এইরূপ নানাকাজে বহু পিপীলিকার প্রয়োজন। প্রয়োজনে জীবের উপযুক্ত বুদ্ধির বিকাশ হয়। নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে শ্রমিকের অভাব হইলে উহারা কাজ করাইবার জন্য 'বেগার' পিপীলিকা ধরিয়া লইয়া আসে এবং পুরীর মধ্যে আটক রাখিয়া নানা কাজ করাইয়া লয়।

এই উদ্দেশ্যে উহারা নিকটস্থ কোন পিপীলিকা-পুরী আক্রমণ করিয়া উহার ডিম কাড়িয়া লইয়া আসে। এই ডিমগুলি আপনাদের অধীনে ফুটাইয়া লয়। পূর্ণাঙ্গ পিপীলিকা ধরিয়া আনিলে সুযোগ পাইলেই উহারা পলাইয়া যাইবে, সেইজন্য ডিম কাড়িয়া লইয়া আনিয়া ফুটাইয়া লওয়া হয়।

মধুর জন্য মধুপায়ী পোষা

সবুজ গাছ-পালার মধ্যে একপ্রকার সবুজ যেওয়ালি পোকা জন্মায়। ইহাদিগের পিঠে দুইটি সরু নল থাকে, এই নলে মধু পূর্ণ থাকে, প্রয়োজন হইলে উহারা ঐ দুইটি হইতে মধু বাহির করিয়া লয়।

এই মধু পিপীলিকাদিগের অতি প্রিয়। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় হয়ত এক সারি পিপীলিকা গাছপালার মধ্য দিয়া চলিয়াছে। পথে মধুপায়ী পোকার দেখা পাইলে, উহা মধু-নলে মুখ দিয়া এক চুমুক মধু পান করিয়া তবে অগ্রসর হয়। মিষ্টরসলোভী পিপীলিকার পক্ষে ইহা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক।

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের কথা যে পিপীলিকারা এইরূপ মধুর লোভে ঐরূপ পোকা পোষে। দুধের জন্য গরু পোষার মত মধুপায়ী পোকা পোষা, পিপীলিকার পক্ষে এক অতি অদ্ভুত ব্যাপার। ইচ্ছা করিলে মধু পাইবার জন্য পিপীলিকারা ঐরূপ বহু পোকা নিজেদের বাসায় লইয়া সযত্নে খাইতে দিয়া পোষে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পিপীলিকারা উক্ত পোকার ডিমগুলি নিজেদের

বাসায় লইয়া গিয়া কোটায় এবং ডিম ফুটিয়া পোকা জন্মিলে সযত্নে লালন পালন করে। এই পোকাগুলির জন্য উহারা উপযুক্ত কক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, ইহাদের উপযুক্ত লতাপাতা আনিয়া দেয় এবং উহাদিগের কক্ষগুলি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখে। এইরূপে সযত্নে পোকা পুষিয়া পিপীলিকার দল প্রয়োজন মত মধু পান করে।

পিপীলিকারা ঐ 'মধুদা' পোকা ছাড়াও আরও পঞ্চাশ রকমের পোকা ও ক্ষুদ্র জীব ধরিয়া রাখিয়া নানা কাজ করাইয়া লয়। এই পোষা পোকাগুলির মধ্যে একটিকে উহারা কেবল আদর করিবার জন্য পোষে। এই পোকাটিকে দিয়া কোন উপকারই হয় না, পরিবারভুক্ত একজনের মত খায় দায় ও আনন্দে বেড়ায়। ক্ষুধা লাগিলে পিপীলিকার মতই উহারা কোন পিপীলিকার শুড় স্পর্শ করিয়া আপন প্রয়োজন জানাইলে উহার ভুক্ত অন্নের ভাগ পায়।

এই গল্পগুলি 'রূপকথার' মত শুনাইলেও রূপকথা মোটেই নয়, বহু বৈজ্ঞানিকের দেখা অতি সত্য কথা। বৈজ্ঞানিকগণ পিপীলিকার জন্য কাঁচের ঘর প্রস্তুত করিয়া দিয়া উহাদিগের জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি লক্ষ্য করিয়া এই সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

সকল পিপীলিকাই ভূগর্ভে বাসা করে না। কতক গাছে কাদা লইয়া গিয়া বাসা বাঁধে; আর কেহ কেহ নরম কাঠে ফুটা করিয়া পুরী নির্ম্মাণ করে।

যে সকল কথা পূর্ব্বে বলিলাম ঐগুলির মধ্যে পিপীলিকার নিত্য জীবন-ধারার মধ্যে একটা বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু একটা অজানা সমস্যা দেখা দিলে উহারও সুন্দর সমাধানে পিপীলিকারা যে উপস্থিত-বুদ্ধির পরিচয় দেয় তাহা অতি আশ্চর্য্য। এইরূপ উপস্থিত-বুদ্ধির পরিচয়ের দুই একটি কথা বলি।

পিপীলিকার উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয়

এক ভদ্রলোকের রান্নাঘর ও ভাঁড়ারে পিপীলিকার জ্বালায় কোন জিনিষই অক্ষত রাখিবার যো ছিল না। পচনশীল খাদ্যদ্রব্য তিনি একটি শক্ত বাক্সে করিয়া দালানে দেওয়ালের গায়ে ঝুলাইয়া রাখিতেন। এই বাক্সে কোন ফাঁকই

ছিল না। কাঠের গায়ে অতি ক্ষুদ্র ফুটা পাইয়া পিপীলিকার দল উহা কাটিয়া বড় করিয়া তুলিল। কিছুদিন পরে দেখা গেল বাক্সটি পিপীলিকা থিক্ থিক্ করিতেছে।

ভদ্রলোক তখন বাক্সটিকে দেওয়াল হইতে দুই ইঞ্চি সরাইয়া কড়ি হইতে তার দিয়া ঝুলাইয়া দিলেন। এই তারটিতে মোটা খনিজ তৈল মাখাইয়া রাখিলেন। কিছুদিন পিপীলিকার উৎপাত কমিয়া গেল, তাহার পর একদিন দেখা গেল উহারা পূর্ব্বের মত আক্রমণ চালাইয়াছে। খোঁজ করিয়া দেখা গেল দেওয়াল ও বাক্সের ফাঁকটুকুর উপর সেতুর মত এক টুকরা খড় পিপীলিকারা দেওয়াল বহিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছে এবং উহার এক প্রান্ত দেওয়ালের একটি খাঁজে রাখিয়া অপর প্রান্তটী বাক্সের উপর দিয়া একটা সেতু গড়িয়া তুলিয়াছে। এই খড়ের সেতু দিয়া সারি সারি পিপীলিকার দল চলিয়াছে মানুষের বুদ্ধিকে হার মানাইয়া।

এইরূপ ঠিক আর একটী ক্ষেত্রে দেওয়ালে খড়ের টুকরাটী আটকাইবার জন্য কাদা লইয়া গিয়াছে দেখা গেল। নিজেদের মুখের রস ও কাদা মাখিয়া খড়ের দুই প্রান্ত দেওয়াল ও খাদ্যের বাক্সে আঁটিয়া দিয়াছে। এই সব দেখিয়া তাহাদের অদ্ভুত বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

আর একটি গল্প বলি। একটী পিপীলিকার বাসার নিকটেই একটী নালায় সকল সময়েই জল বহিয়া যাইত। নালাটী প্রায় এক ফুট চওড়া। এই নালার অপর পার হইতে উহাদিগের খাদ্য যোগাড় হইত। পিপীলিকাদিগের মধ্যে বহু ইঞ্জিনিয়ার দেখা যায় বটে, কিন্তু নৌকা ব্যবহার চোখে পড়ে না।

বাসার দিকে নালার পাশে দীর্ঘাকার ঘাস জন্মিয়াছিল। এই ঘাসের একটি ডগা বাঁকিয়া ঝুলিতেছিল। এইটিকে বাঁকাইয়া অপর পারে ফেলিলে জলের উপর একটী সেতু প্রস্তুত হয়। দেখা গেল এই জিনিষ পিপীলিকাদিগের দৃষ্টি এড়ায় নাই।

প্রথমে একটী, তাহার পিছনে আরও দুইটী পিপীলিকাকে ঐ ঘাস বহিয়া

যাইতে দেখা গেল। উহারা ঘাসের ডগায় উপস্থিত হইলে ডগাটী নুইয়া নালার পরপারে গিয়া পড়িল এবং উহারা ঐ ডগাটীকে কাদা ও নিজেদের মুখের রস দিয়া মাটীর সহিত গাঁথিয়া দিয়া যাতায়াতের একটী সেতু গড়িয়া তুলিল।

একবার একজন বৈজ্ঞানিক কয়েকটী বিভিন্ন বাসা হইতে কয়েকটী করিয়া পিপীলিকা ধরিয়া সরবতের সহিত মদ মিশাইয়া দিয়া খাওয়াইয়া দিলেন। এই মদ মিশ্রিত সরবৎ খাওয়াইবার পর পিপীলিকাগুলি মাতাল হইয়া উঠিল।

এই অবস্থায় ঐগুলিকে লইয়া গিয়া একটি বাসার নিকটে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তাহার পরই দেখা গেল ঐ বাসার কয়েকটী পিপীলিকা বাহির হইয়া ব্যাপার দেখিতে গেল। পিপীলিকাদিগের অদ্ভুত ব্যবহার দেখিয়া উহারা অদ্ভুত রোগের অদ্ভুত ব্যবস্থা করিল। উহারা আপন জনদিগকে মুখে করিয়া লইয়া গিয়া বাসায় রাখিয়া আসিল এবং অন্যান্য বাসার পিপীলিকাগুলিকে মুখে করিয়া লইয়া গিয়া নিকটস্থ এক ডোবায় ডুবাইয়া দিল।

এইরূপ পরীক্ষা বৈজ্ঞানিকগণ বহুবার করিয়া প্রত্যেকবারই একই ব্যাপার তাঁহাদের চোখে পড়িয়াছে। এই ব্যাপার হইতে উহাদিগের স্বজনপ্রিয়তার যেমন প্রমাণ পাওয়া যায়, তেমনি স্বজন ব্যতীত আর সকলের প্রতি পরম শত্রুতারও পরিচয় পাওয়া যায়।

হঠাৎ কোন বিপদে পড়িলে পিপীলিকাদিগের বুদ্ধি কিরূপ খোলে তাহার একটা উদাহরণ দিই। এক ভদ্রলোক একদিন দেখিলেন পিপীলিকার এক অতি দীর্ঘ সারি চলিয়াছে এক গাছের ডালে ডালে মধুস্রাবী পোকার অন্বেষণে। উহাদিগের ফিরিবার পথে ঐ ভদ্রলোকটী গাছের গুঁড়ির চারিদিকে আলকাতরার একটী কটীবন্ধ মাখাইয়া দিলেন।

পিপীলিকারা পোকা লইয়া ফিরিবার পথে ঐ আলকাতরার কটীবন্ধের কিনারায় আসিয়া থামিল। ঐ আলকাতরার মারাত্মক জলা পার হওয়া উহাদের পক্ষে এক বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। উহারা সম্মুখে ঐরূপ ভীষণ আলকাতরার বাঁধ দেখিয়া ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। বিপদে পড়িলে অনুরূপ

বুদ্ধির অভাব উহাদিগের কখনই হয় না। উহারা শেষ পর্য্যন্ত পোকাগুলিকে গাছের পাতা হইতে আনিয়া আলকাতরার উপর ফেলিয়া ফেলিয়া এক সেতু গড়িয়া তুলিল এবং উহাদিগের উপর দিয়া চলিয়া তখন অনায়াসেই আলকাতরার বাঁধ পার হইয়া চলিয়া গেল। ইহাদের মধ্যে মানুষের মত বুদ্ধির সহিত নির্ম্মমতার অভাব নাই।

পিপীলিকাদিগের গঠন-বুদ্ধিশক্তি কেবল মাত্র ছোট ছোট কাজেই শেষ হয় নাই। একটী নাতি বৃহৎ নদী পার হইবার জন্য নদীর তলদেশ দিয়া সুড়ঙ্গ কাটিয়া পথ করিয়াছে এমন একটি কীর্ত্তিও ধরা পড়িয়াছে। এরূপ বৃহৎ কার্য্য করিতে হইলে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনার প্রয়োজন।

পিপীলিকারা কোন রহস্যময় ইন্দ্রিয় সাহায্যে এইরূপ বৃহৎ কার্য্য করে? উহারা কি করিয়া জানিতে পারিল নদীর আর একটী পাড় আছে বা অপর পাড়ে উহাদিগের বাসোপযোগী স্থান আছে? উহাদিগের দৃষ্টি, শ্রবণ বা ঘ্রাণ শক্তিও যদি থাকে, ঐগুলি এত ক্ষীণ যে উহার সাহায্যে নদীর অপর পারের খবর জানিতে পারা সম্ভব নহে।

তবে কি আমাদের জানা পাঁচটী ইন্দ্রিয় ছাড়াও ষষ্ঠ কোন ইন্দ্রিয়ের উন্মেষ এই সকল জীবের মধ্যে ঘটে?

পিপীলিকার যুক্তিপণ

ক্ষুদ্র পিপীলিকাদিগের জীবনযাত্রা যতই লক্ষ্য করা হয় ততই উহাদিগের বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। একদিন এক বৈজ্ঞানিক দেখিলেন একদল পিপীলিকা একটী মরা পোকাকে অতি কষ্টে টানিয়া আনিয়া উহাদিগের এক শত্রুপক্ষের বাসার সম্মুখে রাখিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। এই বিপরীত ব্যবহার দেখিয়া ভদ্রলোকের কৌতূহল বাড়িয়া গেল, তিনি দাঁড়াইয়া শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

ঐ বাসার পিপীলিকাদিগের বহু দাস ছিল। ঐ দাসদিগের মধ্যে যাহারা

পোকাটি আনিয়াছিল তাহাদের কয়েকটি স্বজন ছিল। কিছুক্ষণ পরেই বাসার রক্ষকগণ বাহিরে আসিয়া পোকা-বাহকদিগের সহিত যেন কিছু পরামর্শ করিল। তাহার পরেই রক্ষকেরা পোকাটিকে বাসায় টানিয়া লইয়া গেল এবং কয়েকটি দাস লইয়া ফিরিয়া আগন্তুক পিপীলিকাদিগকে দিয়া গেল। এই ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় আগন্তুক পিপীলিকারা মৃত পোকাটিকে মুক্তিপণ স্বরূপ দিয়া কয়েকটি স্বজাতি পিপীলিকাকে শত্রুপক্ষের কবল হইতে মুক্ত করিয়া আনিল।

ডিম লুণ্ঠনের জন্য আক্রমণ

একজন ভদ্রলোক (M. P. Haber—১৮০৪ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে) একদিন সন্ধ্যায় জিনিভার উপকণ্ঠে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন যে কাঠ পিপড়ার এক বিশাল বাহিনী রীতিমত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অতি দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। ঐ বাহিনী সম্মুখদিকে ৮।১০ ইঞ্চি ও পিছনে প্রায় ৩৪ ইঞ্চি স্থান জুড়িয়া অগ্রসর হইতেছে। কয়েক মুহূর্ত্তেই উহারা পথ ছাড়িয়া একটি ঘন বেড়া ভেদ করিয়া গোচারণের মাঠে গিয়া পড়িল। ভদ্রলোকের কেমন কৌতূহল হওয়ায় তিনিও এই বাহিনীর পিছু পিছু চলিলেন।

মাঠের ঘাসের বাধায় উহাদের সারিবদ্ধ শৃঙ্খলিত গতি ভাঙ্গিয়া পড়িল না। ঐ শৃঙ্খলিত সুসংযত বাহিনী বাঁকিয়া, ডিঙ্গাইয়া, মাঠ ভাঙ্গিয়া এক কালচেটে রংএর পিপীলিকাদের পুরীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল।

এই পুরীর চূড়াটি ঘাসের উপরে দেখা যাইতেছিল। পুরীর দ্বার রক্ষকেরা আক্রমণকারী বাহিনীকে আসিতে দেখিয়া বাহিনীর অগ্রভাগকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিল। পুরী শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে এ সংবাদ পুরীমধ্যে যাইতে বিলম্ব হইল না। তৎক্ষণাৎ পুরী হইতে অসংখ্য পিপীলিকা পুরী রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিয়া দলে দলে বাহির হইয়া পড়িল।

আক্রমণকারী বাহিনীর মূলভাগ অগ্রভাগ হইতে প্রায় তিন পা পিছনে ছিল। উহাদিগের অগ্রভাগ আক্রান্ত হইবামাত্র, মূলভাগ নিমেষে পুরীরক্ষী

বাহিনীর উপর সরোষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। তখন ছত্রভঙ্গ রক্ষীদল পলাইয়া গিয়া পুর মধ্যে আশ্রয় লইল।

যুদ্ধের এই প্রথমভাগে জয়লাভ করিয়া উহারা পুরীর চূড়ায় উঠিয়া উহার পথগুলি অধিকার করিল। ইতিমধ্যে আক্রমণকারীর দলের কয়েকটি পিপীলিকা পুরী ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার পথ করিতে লাগিয়া পড়িল। শীঘ্রই তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। পুরীর কয়েক স্থান ভেদ করিয়া দলে দলে উহারা পুরমধ্যে প্রবেশ করিল। কয়েক মিনিট পরেই দেখা গেল আক্রমণ-কারীর দলের প্রত্যেকে, মুখে আক্রান্ত দলের ডিম লইয়া, পুরী হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে।

এইরূপে ডিম কাড়িয়া লইবার জন্য আক্রমণ প্রায়ই চোখে পড়ে। আক্রমণ-কারীরা দলে শতখানেক হইতে দুই হাজার পর্য্যন্ত থাকে। কোন কোন শ্রেণী পিপীলিকার মধ্যে লুণ্ঠিত দাস দিয়া কাজ করান এরূপ ব্যাপক যে লুণ্ঠনকারীরা পুরীর কোন কাজই করে না, দাসেরাই সব কাজ করে; এমন কি নিজেরা খায় না, যে পর্য্যন্ত না দাসেরা আসিয়া মুখে আহার তুলিয়া দেয়। আমাদের দেশের অভিজাত সম্প্রদায়কে ইহাদের নিকট হার মানিতে হয়। দাসেরা মুখে তুলিয়া না দিলে প্রাচুর্য্যের মধ্যেও উপবাসে মারা পড়িবে সেও স্বীকার, কিন্তু নিজেরা আহার গ্রহণ করিয়া প্রাণ বাঁচাইবে না। অদ্ভুত কর্ম্মফল কাহাকেও ছাড়ে না।

শিকারী পিপীলিকা

পশ্চিম আফ্রিকা ও ব্রাজিলে এক প্রকার শিকারী পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের বিশাল বাহিনী যখন শিকারে বাহির হয়, তখন সে দেশ ছাড়িয়া ইঁদুর, টিকটিকি, পোকামাকড়, সাপ পর্য্যন্ত পলায়। দেশের লোকেরা ঐরূপ ক্ষুদ্র জীবের উৎপাত হইতে দিন কতক বাঁচে। তবে এইরূপ অবস্থায় নিজেদের বাঁচাইবার জন্য খাট ইত্যাদির পায়াগুলি জলে ডুবাইয়া রাখে। তাহা না হইলে ঐরূপ শিকারী পিপীলিকাবাহিনীর হস্তে অশেষ বিপদের সম্ভাবনা।

ঐরূপ পিপীলিকা-বাহিনী কোন স্থানে আসিতেছে বুঝিতে পারা যায়, ভয়ার্ত্ত ইঁদুর আদি ছোট ছোট জীবগুলির প্রাণ লইয়া পলায়ন দেখিয়া। কোন বাড়ীতে ঐ বাহিনী প্রবেশ করিলে, উহারা বাড়ীর প্রতি কোণটি পরিষ্কার করিয়া ফেলে। মাকড়সা, সাপ, ঝিঁঝিঁপোকা, আরশুলা, টিক্‌টিকি গিরগিটি, ছোট বড় ইঁদুর এমন কি সম্মুখে পড়িলে দুই তিন হাত দীর্ঘ সাপও উহাদের হাতে নিস্তার পায় না। এক একটির উপর উহারা দলে দলে পড়িয়া জীবন্ত খাইয়া ফেলে; কেবল-মাত্র উহাদিগের কঙ্কালগুলি পড়িয়া থাকে।

ইহাদের আসা, থাকা ও যাওয়ায় খুব বেশী সময় লাগে না। কিন্তু ইহারা এত কর্ম্মতৎপর, যে ঐ বাহিনী কোন বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া চলিয়া গেলে দেখা যায়, বাড়ী এমন পরিষ্কার যে লোকে হাজার খাটিয়াও সেরূপ পরিষ্কার কোন দিন করিতে পারিত না।

সৌভাগ্যের বিষয় এই শিকারী পিপীলিকারা গাছে চড়ে না, সেইজন্য পাখী, কাঠবিড়ালীর মত জীব যাহারা গাছে বাসা বাঁধে উহারা রক্ষা পায়। আমাদের দেশেও এইরূপ কালচেটে রংএর একপ্রকার শিকারী পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায়।

একবার শ্রীরামপুরে প্রায় তিন হাত লম্বা একটি ঘুমন্ত বিষধরকে ঐরূপে এক শিকারী পিপীলিকার বাহিনী আক্রমণ করে। কিছুক্ষণ পরেই সর্পের নিদ্রা ভাঙ্গিল বটে, কিন্তু হাজার চেষ্টা করিয়াও উহাদের কবল হইতে কিছুতেই সে মুক্তি পাইল না। উহার লাঙ্গুলের ঝাপটায় বহু পিপীলিকা প্রাণ হারাইল বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল সর্পের মাত্র কঙ্কালটি ফেলিয়া রাখিয়া ঐ শিকারীর দল চলিয়া গিয়াছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই শিকারী পিপীলিকারা একেবারে কাণা, কিছুই দেখিতে পায় না। কোন্ অজানা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উহারা ইচ্ছামত কার্য্য করে, উহা এখনও ধরা পড়ে নাই। যাহাদের চক্ষু আছে, উহারাই বা কি উপায়ে বিপদ, ভয়, ভালবাসা, প্রয়োজন, দিকজ্ঞান বা কোন ঘটনা ইত্যাদি বিষয় এক অপরকে

জানায় তাহাও সঠিক আমরা বুঝিতে পারি না। বহু প্রকারের পরীক্ষার পর একমাত্র সিদ্ধান্ত করা ছাড়া উপায় নাই—আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত এই জীবে একাধিক ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হয়।

আমাদের দেশের পিপীলিকা

আমাদের দেশে সাধারণতঃ এই কয়েক প্রকার পিপীলিকা চোখে পড়ে :

(ক) সড়সড়ে ক্ষুদে পিঁপড়ে। বিশেষ কামড়ায় না, গায়ে উঠিলে একটা সড়সড়ে অনুভূতি জাগে।

(খ) কাল ডেয়ো-পিঁপড়ে। একবার কামড় দিলে মাংস না লইয়া ছাড়ে না। বেশ বড় দেখিতে। চিনি, মিছরী, গুড় ইত্যাদির মত মিষ্ট দ্রব্যেই বেশী দেখা যায়।

(গ) লাল কাঠ-পিঁপড়ে। ঘরের মরা পোকা মাকড় খাইয়া গৃহস্থের অপকার অপেক্ষা উপকারই বেশী করে। ইহাদের গ্রাসে ছারপোকা হইতে আরম্ভ করিয়া আরশুলা পর্য্যন্ত কিছুই বাদ যায় না। প্রায় দেখা যায় একদল ক্ষুদে পিঁপড়ে উহাদের তুলনায় এক অতিকায় মরা আরশুলা টানিয়া লইয়া বাসার দিকে চলিয়াছে।

(ঘ) হলদে মাঝারি পিঁপড়ে। ইহাদের কামড়েও বড় জ্বালা।

মানুষের সহিত পিপীলিকার আশ্চর্য্য মিল দেখিতে পাওয়া যায়। মানব সমাজের অসভ্য জাতির মত একদল পিপীলিকাকেও শিকার করিয়া জীবন ধারণ করিতে দেখা যায়। তাহার পর মানুষ যেমন পদে পদে সভ্যতার শিখরে উঠিবার সময় ক্রমে ক্রমে বাসা বাঁধিতে শিখে, চাষ বাস করে, নূতন নূতন দেশে প্রয়োজন মত উপনিবেশ গড়ে, পুরীর শৃঙ্খলার জন্য রক্ষীদল হইতে আরম্ভ করিয়া মেথরের কাজ করিবার লোক নিযুক্ত করে, ঠিক সেইরূপ পিপীলিকাদের জীবন-যাত্রা লক্ষ্য করিলে, ঐগুলির কোনটিই বাদ পড়ে না। এমন কি প্রাচীন

রোমের চূড়ান্ত বিলাসের দিনে অভিজাত সম্প্রদায় যেমন সকল কাজই ক্রীতদাস দিয়া করাইয়া লইত, নিজেরা কুটো টি নাড়া অপমানকর মনে করিত,—পিপীলিকা সমাজেও এইরূপ অভিজাত সম্প্রদায়ের অভাব নাই। এ বিষয়ে পিপীলিকা সমাজের অভিজাতগণ রোমকেও হার মানাইয়াছে। ঐরূপ অভিজাত বংশীয় পিপীলিকারা প্রাচুর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও দাসেরা খাওয়াইয়া না দিলে না খাইয়া মরিয়া যাইবে তথাপি নিজেরা খুঁটিয়া খাইবে না।

১০

উই

অধিকাংশ কীটজাতীয় জীব জন্মাবধি তিনটি দশায় (Stages) পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়। প্রথম দশায় ডিম, দ্বিতীয় দশায় গুটিবদ্ধ কীট, তৃতীয় দশায় পূর্ণাঙ্গ কীট। গুটিবদ্ধ কীটাবস্থায় উহাদের কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না, কিন্তু উহাদের বৃদ্ধি বন্ধ থাকে না।

উই, পোকা হইলেও, উহার জীবনে মাত্র দুইটি দশা দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তির জন্য গুটিবদ্ধ কীটাবস্থার প্রয়োজন হয় না। পিপীলিকার জীবনযাত্রার সহিত উইয়ের জীবন যাত্রার অদ্ভুত মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

উই ও পিপীলিকা

উইপোকা পিপীলিকার মতই বৃহৎ গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া বাস করে। ইহাদের শরীর গঠন একই প্রকার। ইহাদের সমাজে পিপীলিকাদের মতই সৈন্য, শ্রমিক, ধাত্রী, মেথর প্রভৃতি শ্রমবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা

পাওয়া দেখা যায় উহাদের বংশধারা রক্ষার ব্যবস্থায়। এই ক্ষেত্রেও পিপীলিকাদের মতই ইহারা একটিমাত্র স্ত্রী ও পুরুষ কীট হইতেই প্রতি গোষ্ঠীর কীট সমাজ গড়িয়া তুলে।

একটা বিষয়ে উহাদের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ দেখা যায়। গর্ভধারিণী উইয়ের কক্ষের পাশের কক্ষেই এমন কতকগুলি স্ত্রী-কীট উহারা সযত্নে রক্ষা করে যে 'রাণীটি' হঠাৎ মরিয়া গেলে, ঐগুলি হইতে একটিকে দিয়া ডিম পাড়ান চলিতে পারে। এই অভিনব ব্যবস্থা পিপীলিকাদের মধ্যে দেখা যায় না। এই বিষয়ে উইপোকার সহিত মৌমাছির সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রায় হাজার প্রকারের উইপোকা এ পর্যান্ত পাওয়া গিয়াছে, উহার মধ্যে মাত্র দুই শতের জীবনযাত্রা পণ্ডিতেরা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন।
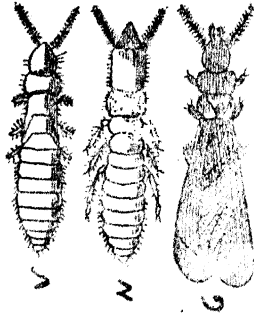
১। শ্রমিক ২। সৈনিক ৩। পতঙ্গ-উই

উইয়ের জন্মভূমি

ইয়োরোপের দক্ষিণ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত পৃথিবীর উষ্ণ মণ্ডলের সকল দেশগুলিতেই উইপোকা জন্মে। আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়াতেই ইহাদের প্রাদুর্ভাব বেশী।

উইয়ের জাতিভেদ

ইহাদের আকারের পার্থক্য যেমন নানা জাতির মধ্যে লক্ষ্য হয়, তেমনি একই জাতির নানা শ্রেণীর মধ্যেও দেখা যায়। পুরারক্ষা কার্যে নিযুক্ত উইপোকা সাধারণ শ্রমিকদের অপেক্ষা প্রায় দশ পনর গুণ বড়। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, ক্ষুদ্রকায় সাধারণ শ্রমিকেরা বিশালবপু সৈন্যগণ অপেক্ষা ভাল যুদ্ধ করিতে পারে।

উই-গ্রাম

উইপোকাদের মধ্যে কোন কোন জাতি ক্ষুদ্র দলে বাস করে এবং নানা স্থানে অনবরত ঘুরিয়া বেড়ায়। আবার কোন কোন জাতি সুবৃহৎ উই ঢিপি নির্মাণ করিয়া হাজারে হাজারে এক পুরীতেই বাস করে। আফ্রিকার দক্ষিণ ও মধ্য ভূভাগে ও অষ্ট্রেলিয়ার উই ঢিপিগুলি প্রায় পঁচিশ হাত পর্যান্ত উচ্চ হইতে দেখা যায়। ঐ সকল দেশের কোন কোন স্থানে উইপোকাগুলি এত কাছাকাছি উই ঢিপিগুলি গড়িয়া তোলে যে ঐগুলিকে উই-গ্রাম বলিলে ভুল হইবে না। অষ্ট্রেলিয়ার কেপ্ ইয়র্কের নিকটে ঐরূপ একটি একবর্গ মাইল ব্যাপিয়া উই-নগর সমুদ্র হইতেও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

উইঢিপি

উইপোকারা কাঠ খাইয়া যে মলত্যাগ করে, উহাই কাদার সহিত মিশাইয়া শুকাইলে ইটের মত শক্ত হয়। উইপোকারা এইরূপ উপাদানে উইঢিপি গড়ে।

একটি উইঢিপিকে চূড়া হইতে ভূমি পর্য্যন্ত মাঝামাঝি চিরিয়া ফেলিলে উই-পুরীর গঠন কৌশল ধরা পড়ে। এই পুরীর কেন্দ্রের নিকট "রাজা-রাণীর" কক্ষ। এই কক্ষে পুরীর গর্ভধারিণী উইরাণী ও তাহার রাজা বাস করে। তাহার নিকটেই কয়েকটি কক্ষে কয়েকটি স্ত্রী-উইকে এমন যত্নে পালন করা হয় যে উই-রাণী হঠাৎ মরিয়া গেলে তাহার স্থান একজন লইয়া পুরীর বংশ-ধারা বজায় রাখিতে পারে।

উই-পুরীর অন্দরের দৃশ্য

১। কীট পালন গৃহ ২। লতা-পাতা পচাইয়া তাপ উৎপন্ন করিবার স্থান ৩। ব্যাঙের ছাতার চাষ
৪। জল আনিবার কূপ পথ ৫। উইরাণী : একটু লক্ষ্য করিলে ডিম রাখিবার ঘরগুলিও চোখে পড়িবে

রাজকক্ষের নিকটেই ভাঁড়ার ঘর, ডিম ফুটাইবার ঘর এবং কীট-পালকের ঘরগুলি থাকে। এইরূপ আর এক থাক ঘর ভূগর্ভেও দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইতলা পুরীর ধাত্রী, শ্রমিক ইত্যাদির এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাইবার পথ আছে।

উইরাণী

উই-পুরীতে উইরাণীর একটি বিশিষ্ট স্থান হইলেও উহা মোটেই কাহারও মনে হিংসা জাগাইবে না। রাণী দেখিতে উইয়ের তুলনায় অতিকায়; দৈর্ঘ্যে চারি পাঁচ
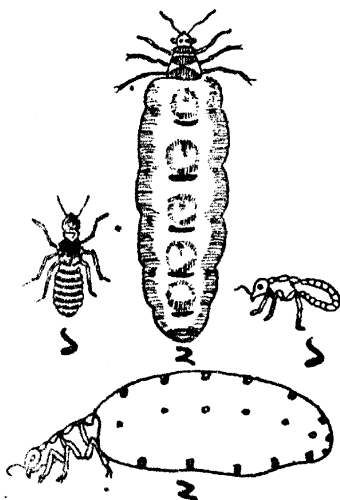
১। উইরাণীর সহচর ২। উইরাণী

ইঞ্চি। পরিষ্কৃত নাড়ি-ভুঁড়ির টুকরার মধ্যে কুচিকুচি মাংস মশলা মাখাইয়া ঠাসিয়া দিয়া এক প্রকার মাংস রান্না প্রচলিত আছে। ইহাকে ইংরাজিতে

'সসেজ' (Sausage) বলে। উইরাণী আকারে, গঠনে ও বর্ণে দেখিতে প্রায় সসেজের মত।

রাজকক্ষে যাতায়াতের পথ এত সরু যে উইরাণী কোনদিন বাহিরে আসিতে পারে না। উইরাণীকে আমরণ আপন কক্ষে বন্দী থাকিতে হয়। মৃত্যু হইলে উইরাণীর দেহ অন্যান্য উইয়েরা খাইয়া ফেলে। এইরূপ অদ্ভুত অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ব্যবস্থা উই সমাজে প্রচলিত।

উইরাণীর এত আদর যে তাহাকে আপন জীবন রক্ষার জন্য কিছুই করিতে হয় না। কেবল অবিশ্রাম ডিম পাড়িয়া পুরীবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা ছাড়া তাহার আর কোন কর্ত্তব্যই নাই। উইরাণীর ডিম পাড়িবার শক্তি অসাধারণ। পণ্ডিতেরা গুণিয়া দেখিয়াছেন যে সেকেণ্ডে একটি করিয়া ডিম উইরাণী পাড়ে। দিনে ৮০,০০০ ডিম পাড়া এক অসাধারণ ক্ষমতা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পিপীলিকাদের সামরিক শ্রেণী পুরী, রক্ষণাবেক্ষণ করা ছাড়া আর কিছুই করে না; কিন্তু উই সমাজের সামরিক শ্রেণী শ্রমিকদিগের কাজে সকল প্রকার সাহায্য করে।

উইপুরীর ব্যবস্থা

বিশাল উইপুরীতে লক্ষ লক্ষ উই একসঙ্গে বাস করে। এই পুরীতে অসংখ্য ডিম হইতে যখন উই বাহির হয়, ঐ ডিমের খোলাগুলি, তাহার পর দিনে দিনে যখন কীটগুলি বাহির হইতে থাকে তখন উহারা মাঝে মাঝে খোলস ছাড়ে, এই ত্যক্ত খোলসগুলি, যেখানে এত উই এক সঙ্গে বাস করে ও অন্যান্য সেখানে দিনে মৃত্যুহারও কম নহে, উহাদের মৃতদেহগুলি, ইহার উপর অন্যান্য আবর্জ্জনা আছেই। এই নানা আবর্জ্জনার কথা ভাবিয়া উই-পুরী একটা বড় দুর্গন্ধময় নোংরা স্থান ভাবা আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে।

উইপুরীর পরিচ্ছন্নতা দেখিলে বিস্ময় জাগে। শ্রমিক ও যোদ্ধা উভয় শ্রেণী মিলিয়া উইপুরীকে এত পরিষ্কার রাখে যে সেখানে কোন সময়েই কোন

প্রকার আবর্জ্জনা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের পুরী পরিষ্কার রাখিবার প্রথা অদ্ভুত। পিপীলিকারা সকল প্রকার আবর্জ্জনা ও নিজেদের মৃতদেহগুলি লইয়া গিয়া বাসা হইতে দূরে একটি স্তূপে জড় করে; কিন্তু উই সকল প্রকার আবর্জ্জনাই, যায় মৃতদেহগুলি পর্য্যন্ত, খাইয়া ফেলে। ইহাদের এই প্রথা হইতে মনে হয় উইয়ের নিকটে কোন জিনিসই ফেলা যায় না। ইহারা নিজেদের মড়া খাইয়া ফেলিয়া যে মিতব্যয়ীতার পরিচয় দেয় উহার তুলনা নাই।

উই-চাষী

পিপীলিকার মত উই জাতির মধ্যেও চাষী দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু উহাদের মত উইয়েরা কোন মধুস্রাবী পোকা পুষিয়া নিত্য মধু পান করিতে জানে না। একটা বিষয়ে ইহারা পিপীলিকাকেও হার মানাইয়াছে। ইহারা শিশুর জন্য এক প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিয়া ভাঁড়ারে সঞ্চয় করিয়া রাখে। উইয়ের মধ্যে একদল নরম কাঠ চিবাইয়া মুখের লালার সহিত মাখিয়া শিশুর ঐ খাদ্য প্রস্তুত করে এবং কীটশিশুগুলিকে খাওয়াইবার জন্য ভাঁড়ারে সযত্নে তুলিয়া রাখে।

উইয়ের যাতায়াত-পথ

উইয়ের দেশে বাস করিতে হইলে বড়ই সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। যাহারা নিজেদের মড়াগুলিই খাইয়া ফেলে তাহাদিগের নিকটে অখাদ্য বলিয়া কিছুই নাই। উইয়ের সুড়ঙ্গ পথে আনাগোনা করা অভ্যাস। শক্ত কাঠেও ইহারা এত দ্রুতগতিতে সুড়ঙ্গ কাটিতে পারে যে উহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। আজ রাত্রে যে খাবার টেবিল বেশ ব্যবহার করা গিয়াছে, কাল সকালে ব্যবহার করিতে গিয়া উহা সশব্দে পড়িয়া গেল। তখন পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে টেবিলের উপর খাদ্যের গন্ধে উইয়েরা একটি পায়ার সুড়ঙ্গ কাটিয়া উপরে উঠিয়া আহার শেষে অন্য এক পায়ায় সুড়ঙ্গ কাটিয়া এক

রাত্রেই নামিয়া গিয়াছে। পিপীলিকা উপর দিয়া চলে, উই উহার নীচে সুড়ঙ্গ না কাটিয়া কিছুতেই চলিবে না।

এক সাহেব সর্ব্বনাশী কচুরী পানার নীল ফুলে মুগ্ধ হইয়া দক্ষিণ আমেরিকা হইতে উহাকে আমাদের দেশে লইয়া আসেন। উহার পূর্ব্বে আমাদের দেশে কচুরীপানা জন্মিত না। তাহার পর আজ কচুরীপানার জ্বালায় লোকে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। ঠিক এইরূপ আর একটি ব্যাপার সেন্ট হেলেনা দ্বীপে ঘটে। দৈবক্রমে জাহাজের মালের সহিত ১৮৭৫ খৃঃ ঐ দ্বীপে কয়েকটি উই আসিয়া পড়ে। ইহার পূর্ব্বে ঐ দেশে উই জন্মিত না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে উইয়ের বংশ এরূপ বৃদ্ধি পাইল যে উহারা ঐ দ্বীপের জেমস্ টাউন নামক সহরটির কাঠের বাড়ী, ঘর, দুয়ার, আসবাব-পত্র প্রায় সকল দ্রব্যই খাইয়া শেষ করিয়া ফেলিল। ফলে ঐ সহর পুনরায় নূতন করিয়া গড়িতে হইয়াছিল। উইয়ের এরূপ উৎপাত আর কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় নাই।

দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য উইয়ের দেশে যখন উইগুলি দলে দলে পতঙ্গ হইয়া উড়িতে থাকে, তখন সময়ে সময়ে আকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই অসংখ্য পতঙ্গের পাল যখন মাটিতে নামে, তখন পক্ষীকুলের ভাগ্যে প্রচুর সুস্বাদু আহার জুটিয়া যায়। একবার এইরূপ একটি উই পতঙ্গের ঝাঁক নদীবক্ষে নামিয়া পড়ায় নদীর দুই পাড় বহু দূর পর্য্যন্ত উইয়ের মৃতদেহে এমন ভরিয়া উঠিল যে উহার পচা গন্ধে এক মাইলের মধ্যে বাস করা দায় হইয়া উঠিয়াছিল।

উই ও পিপীলিকার জীবন যাত্রায় বহু মিল থাকিলেও একটি বিষয়ে উহাদিগের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত। পিপীলিকা উইয়ের মত অন্ধকার ভূগর্ভে বাসা বাঁধিলেও আলোয় আনাগোনা করে, খাদ্য শুকায়; কিন্তু উই আলো একেবারেই পছন্দ করে না, এমন কি দীর্ঘ পথ যাইবার কালেও ভূমির উপর দিয়া না চলিয়া ভূগর্ভে শত শত হাত সুড়ঙ্গ কাটিয়া চলে।

উইয়েদের মধ্যে কোন কোন জাতি কাদা লইয়া গিয়া গাছের উপর বাসা

পড়ে। এই বাসাগুলির আকার কমলা লেবুর মতও হয়, আবার একটা জলের জালার মতও বিরল নহে। গাছে উঠা-নামার জন্তেও উহারা কাদা দিয়া অন্ধকারময় সুড়ঙ্গ পথ নির্ম্মাণ করিয়া লয়। উই বহু জীবের অতি সুস্বাদু আহার, সেই জন্য আত্মরক্ষার জন্তই বোধ হয় উহারা সকল সময়েই অন্ধকারময় সুড়ঙ্গপথে আনাগোনা করে। পচা কাঠই বহু উইজাতির অতি প্রিয় খাদ্য। কোন গাছের উচ্চ ডালের একটা অংশ বোধ হয় পচিয়াছে। উইয়েরা টের পাইয়া গাছের শক্ত গুঁড়ি ভেদ করিয়া উপরে উঠিবে, কিংবা সারা পথ, কাদা দিয়া সুড়ঙ্গ পথ নির্ম্মাণ করিয়া ঐ স্থানে পৌঁছিবে।

শ্রমিক ও সামরিক শ্রেণীর উইয়েদের আকার ও গঠনের পার্থক্যের ঠিক কারণ এখনও ধরা পড়ে নাই। শ্রমিকের মাথা হয় ছোট; কিন্তু সামরিকের মাথা হয় এমনই বড় যে দেখিতেও হয় যেন সঙের মত, কার্য্যকালেও হয় তেমনি অসুবিধা। একই ডিম হইতে কি কারণে বিভিন্ন আকার ও গঠনের উই জন্মায়, তাহা এখনও ঠিক বুঝিতে পারা যায় নাই। ধাত্রীরাই বোধ হয় শিশু কীট-গুলিকে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য খাওয়াইয়া উহাদের বিভিন্ন প্রকারের দেহ গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে।

উইয়ের দেহ বহু পশু-পক্ষীর অতি সুস্বাদু আহার্য। আফ্রিকার ও আমেরিকার বহু আদিম জাতিও উই খাইতে ভালবাসে, সাহেবদের মধ্যে যাহারা এই অপূর্ব্ব আহার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারাও বলেন যে দুধের সরে বাদাম বাটা মিশাইয়া খাইলে বা চিনি মিশ্রিত মজ্জা খাইতে যেরূপ সুস্বাদু, ঠিক সেইরূপ নাকি!

উই আর পিপীলিকার জীবনযাত্রা প্রায় এক পর্য্যায়ে ফেলিলেও পিপীলিকার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সামান্য পরিচয়ও উইয়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।

———

১১

পঙ্গপাল

কথায় বলে 'পঙ্গপাল'। যিনি পঙ্গপালের স্রোত নিজ চোখে দেখেন নাই তাঁহাকে ইহার বিশালতা ও অপ্রতিহত গতির কথা বলিয়া বুঝান বড় শক্ত।

লেখক বাল্যকালে একবার এক পঙ্গপালের স্রোত দেখিয়াছিলেন। তাঁহার সে কথা এখনও বেশ মনে আছে। হঠাৎ কোথাও কিছু নাই, পরিষ্কার আকাশ মেঘে ঢাকিয়া গেল। সুন্দর বিকাল বেলাটিতে খেলা-ধূলা হইতে বঞ্চিত হইয়া আমরা বালকের দল যে যার ঘরে গিয়া আশ্রয় লইলাম। ক্রমশঃ সে মেঘ উত্তর দিক হইতে আসিয়া দক্ষিণ মুখে ছুটিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে মেঘ উড়িয়া গেল; বৃষ্টি হইল না, আমরা যেন বাঁচিলাম। পরে জানিতে পারিলাম সে মেঘ জীবের প্রাণস্বরূপ জল ভরা মেঘ ছিল না, উহা পঙ্গপালের এক বিশাল স্রোত উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিকে যাইতেছিল, সেই জন্য সূর্য্য ঢাকা পড়িয়া যাওয়ায় আকাশে মেঘাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল। পরের দিন আমাদের পাশের বাংলোর বৃহৎ তেঁতুল গাছটিকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। উহাতে একটিও পাতা বা তেঁতুল ছিল না, রাতারাতি ভোজবাজিতে যেন গাছটি ন্যাড়া হইয়া গেল। পঙ্গপালের স্রোত হইতে একটি দল বোধ হয় তেঁতুল গাছে আশ্রয় লইয়াছিল। তাহার ফলে পাতা ও ফল পূর্ণ গাছটির কতকগুলি ন্যাড়া ডাল ছাড়া আর কিছুই বাকি রহিল না।

পঙ্গপালের জন্মভূমি

মরুভূমি অঞ্চলেই এই পতঙ্গ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। তবে পৃথিবীর কোন অংশেই ইহার অভাব নাই। প্রাচীন কালে পঙ্গপালের আগমনে দেশে একটা ভীষণ সর্ব্বনাশ দেখা দিত। বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানের কৃপায় নানা

মারণাস্ত্রে নিপুণ মানুষ পঙ্গপালের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় লাভ করিয়াছে।
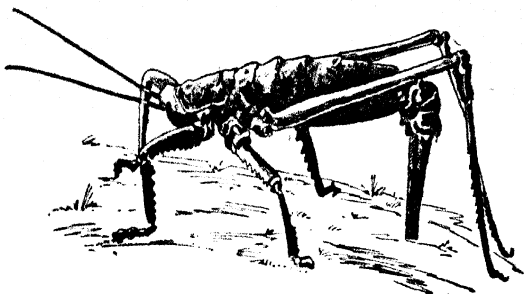
একটি স্ত্রী-পঙ্গপাল মাটিতে আপন ডিম্ব-নলটি প্রবেশ করাইয়া দিয়া ডিম পাড়িতেছে

পঙ্গপালের ডিমপাড়া

দলে দলে স্ত্রী পঙ্গপাল মাটিতে গর্ত্ত করিয়া ডিম পাড়িয়া রাখিয়া যায়। একটি পঙ্গপাল একেবারে প্রায় চল্লিশটি ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিয়া পঙ্গপাল জন্মিবামাত্র ইহা যে উদ্ভিদই সম্মুখে পায় তাহাই খাইতে আরম্ভ করে। ইহাদের জীবনের ব্রতই যেন উদ্ভিদ বংশ ধ্বংস করা।

ডিম হইতে ফুটিবামাত্রই ইহার পাখা জন্মায় না। কয়েকবার খোলস ছাড়িবার পর পাখা গজায়। পতঙ্গের আকারের তুলনায় ইহার পাখার উড়িবার শক্তি দেখিলে অবাক হইতে হয়। সমুদ্রতীর হইতে ১২০০ মাইল দূরেও পঙ্গপালের স্রোত দেখা গিয়াছে।

পঙ্গপালের স্রোতের বিশালতা দেখিলে বিস্ময় মানিতে হয়। ১৯৩২ খৃঃ মরক্কোর উপর দিয়া একটি ৯ মাইল দীর্ঘ ও ৪ মাইল প্রস্থ পঙ্গপালের মেঘ উড়িয়া যাইতে দেখা যায়। এই দলে কত কোটী পঙ্গপাল ছিল তাহা গুণিয়া

শেষ করা যায় না। এই দল উড়িয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই আর একটি দশবর্গ মাইল আয়তনের পঙ্গপালের মেঘ উড়িয়া যাইতে দেখা যায়।

ভূমধ্যসাগরীয় সাইপ্রাস-দ্বীপে মাত্র এক বৎসরে ২০,০০০ কোটী পঙ্গপাল নাশ করা হয়। এই অগণিত পঙ্গপাল মারিতে খরচ হইয়াছিল কোটি প্রতি ১৩৷৷০ টাকা। এই সঙ্গে ১৩০০ টন পঙ্গপালের ডিম নষ্ট করা হয়।

পঙ্গপাল মারিবার উপায়

পঙ্গপাল প্রাণীমাত্রেরই শত্রু। উহারা যে ভূমি দিয়া যায়, সেখানে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পড়ে। মানুষের প্রায় অপরাজেয় এই শত্রুকে জয় করিবার আজ-

পঙ্গপাল আসিবার পূর্ব্বে গাছের রূপ

কাল অনেক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। একটী আন্তর্জ্জাতিক সমিতি পঙ্গপাল ধ্বংসের ভার লইয়াছেন। কোন দেশের উপর দিয়া পঙ্গপালের মেঘ উড়িয়া যাইতেছে সংবাদ পাইবামাত্র উহার যাত্রাপথে বহু খানা খুঁড়িয়া রাখা হয়।

পঙ্গপালের মায়েরা এই খানাগুলিতে হাজার হাজার মণ ডিম পাড়িয়া রাখিয়া যায়। তাহার পর বিষপূর্ণ (সোডিয়াম আর্সেনাইট) জল ঐ খানাগুলিতে ছিটাইয়া দেওয়া হয়। এই বিষের জলে ডিমগুলি নষ্ট হইয়া যায়, আর পঙ্গপাল জন্মাইতে পারে না।

যে দেশ দিয়া পঙ্গপালের অভিযান যায় তাহার এক সুন্দর বর্ণনা পুরাতন বাইবেলে (Exodus, x,) দেখিতে পাওয়া যায়।

পঙ্গপালের কীর্তি

পঙ্গপাল দেখা দিবার পূর্ব্বে দেশ ছিল স্বর্গের উদ্যানের মত। পঙ্গপাল চলিয়া যাইবার পর অভাগা দেশ উদ্ভিদহীন মরু প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে।
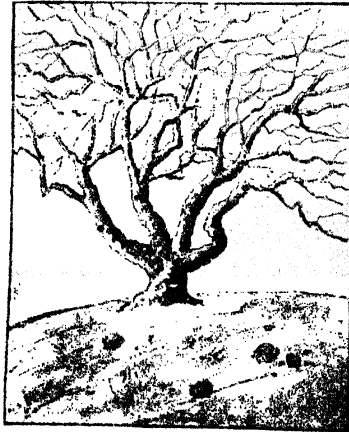
পঙ্গপাল আসিয়া চলিয়া যাইবার পর গাছের রূপ

উহাদিগের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় কিছুই রক্ষা পায় না। শুষ্ক নিষ্করুণ মরুভূমির দুর্দ্দান্ত অশ্বারোহী দস্যুদলের মতই উহারা মনুষ্যের শস্যশ্যামল আবাসভূমি আক্রমণ

করিয়া তৃণলতাহীন অনুর্ব্বর মরু-প্রান্তরে পরিণত করে। উহাদের চলাফেরার ঝর ঝর শব্দের মত শব্দ উঠে। সর্ব্বগ্রাসী বৈশ্বানরের লেলিহান জিহ্বার মত ইহার গতি অপ্রতিহত। অপরাজেয় সৈন্য বাহিনীর মতই উহারা ছুটিয়া চলে, সম্মুখের কোন বাধাই মানে না, মানুষের কোন প্রকার চেষ্টাই উহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিতে পারে না। অসংখ্য কোটী পঙ্গপাল যখন দূর হইতে উড়িয়া আসে,

পঙ্গপালের মুখ
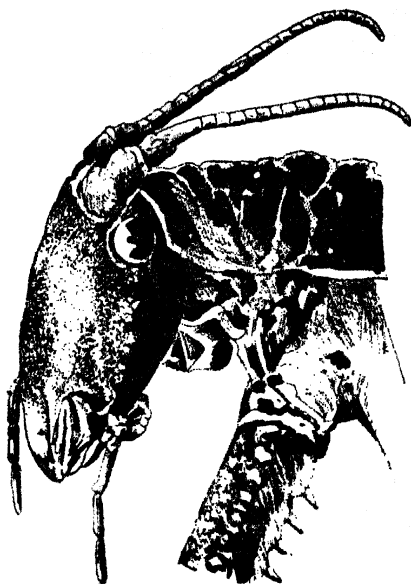
তখন উহাদিগকে কাল মেঘ বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু উহা জলভরা মেঘের মত প্রাণ স্বরূপ বৃষ্টি না আনিয়া, আনে ধ্বংসের করাল ছায়া।

পঙ্গপালের আকার

পঙ্গপাল দৈর্ঘ্যে পাঁচ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। আকারের তুলনায় ইহার শক্তি অতুলনীয়। ইহার পশ্চাতের পা দুখানি খুব শক্তিশালী, এই দুটির উপর ভর দিয়া ইহারা দীর্ঘ ব্যবধান ডিঙ্গাইয়া পার হইতে পারে। ডিম হইতে ফুটিয়া বাহির হইলে ইহাদিগকে নিজ মাতাপিতার মতই দেখিতে হয়, তখন কিন্তু পাখা গজায় না।

১২

মৌমাছি

জীবের ক্রমবিকাশের কারণ

প্রাকৃতিক যোগাযোগে জীব সৃষ্টি হইলে, ঐ অবস্থানুযায়ী আপনাকে মানাইয়া লওয়াই হইল জীবধর্ম্ম। অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে জীব যদি আপনাকে নূতন অবস্থানুযায়ী মানাইয়া চলিতে না পারে, তাহা হইলে উহা পৃথিবী হইতে লোপ পায়। প্রকৃতির কোলে যাহারা বাড়িয়া উঠে, উহারা যত শীঘ্র আপনাকে নূতন পারিপার্শ্বিকে মানাইয়া লইতে পারে, মানুষ আপনার অভ্যস্ত জীবন তত শীঘ্র ত্যাগ করিতে পারে না বলিয়া মানুষকে বহু লাঞ্ছনাই ভোগ করিতে হয়।

যুগে যুগে জীব নূতন নূতন অবস্থায় আপনাকে মানাইতে গিয়া নূতন নূতন অঙ্গ লাভ করিয়া বর্ত্তমান আকার লাভ করিয়াছে। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন অতি ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়; পরিবর্ত্তিত নূতন প্রাকৃতিক অবস্থায় বাঁচিয়া থাকিবার অনুকূল অঙ্গাদি ক্রমশঃ ধীরে ধীরে লাভ করাকেই ক্রমবিকাশ বলে।

মৌমাছি

মৌমাছি ফুলের মধু পান করিয়া বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু সকল ঋতুতে ফুল ফোটে না, সেইজন্ত উহাকে বসন্তকালে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া শীতকালের জন্ত সঞ্চয় করিতে হয়। ফলে মধুপায়ী মক্ষিকার মধ্যে আপনার খাদ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অনুকূল ব্যবস্থার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই অদ্ভুত কথাই এই প্রবন্ধে বলিব।

তিন জাতীয় মৌমাছি

মৌচাকে তিন জাতীয় মৌমাছি বাস করে। প্রথম সংঘজননী, দ্বিতীয় শ্রমিক, তৃতীয় 'বাবু'। গর্ভধারিণী ও শ্রমিক উভয়েই নারী, কেবলমাত্র বাবু-জাতীয় মক্ষিকাগুলি পুরুষ।

বাবুগুলি ছাড়া আর সকলেই আমরণ অবিরাম পরিশ্রম করে।

উহাদিগের কাজ

সংঘজননীর কাজ ডিম পাড়িয়া মৌচাকের মৌমাছির সংখ্যা বৃদ্ধি করা। বাবু মক্ষিকাদিগের বাবুগিরি করাই একমাত্র কাজ। শ্রমিকরা উহাদিগকে

সংঘজননী শ্রমিক মৌমাছি

খাওয়াইয়া পর্য্যন্ত দেয়। এ বিষয়ে তাহারা বাঙ্গালী বাবুদিগকে হার মানাইয়াছে। উহারা খাইয়া ও রৌদ্রে পাখা মেলিয়া উড়িয়া দিন কাটাইয়া দেয়। বাবু

মৌমাছি হওয়া খুব সুখের মনে করিও না। উহাদিগের সংখ্যা বাড়িয়া গেলে, গর্ভধারিণী মৌমাছির কয়েকটি সাথীকে বাদ দিয়া বাকিগুলিকে শীতাগমে মারিয়া ফেলা হয়। ইহার জন্য মক্ষিকাদিগের মধ্য হইতে ঘাতক নিযুক্ত করা হয়। বাবুগুলি দেখিতে সুন্দর, কিন্তু উহাদিগের হুল নাই এবং উহাদিগের ব্যবহারও বড় অশিষ্ট। মৌচাক হইতে আনাগোনার সময় শ্রমিকদিগকে
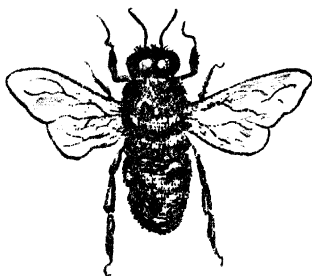
সংঘজননীর সখা বাবু মৌমাছি

এমনভাবে ঠেলিয়া দেয় যে রাণীর সহচর বলিয়াই উহারা উহাদিগের ঐ রূঢ় ব্যবহার সহ্য করে।

মৌমাছির দেহের গঠন

মৌমাছির পাঁচটি চক্ষু। মাথার দুই পাশে দুইটি থাকে, এইগুলি একটিমাত্র লেন্সে গঠিত। মাথার উপরে তিনটি চক্ষু, প্রত্যেকটি বহু লেন্সে গঠিত। শ্রমিকদিগের এইরূপ চক্ষে ৬০০০ দিকে ৬০০০ মুখ থাকে, বাবুদিগের এইরূপ চক্ষে ১৩০০০ মুখ এবং গর্ভধারিণীর ৫০০০ মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে বড় জিনিষের সবটা, দূরের ফুল বা উহার রং দেখার জন্যই কি এই ব্যবস্থা? নিষ্প্রয়োজনে কোন অঙ্গ প্রকৃতি গড়েন না; ক্ষুদ্র জীবের এই অতি জটিল চক্ষের ব্যবস্থা তবে কিসের জন্য?

মাথার দুই পাশ হইতে দুইটি শুঁড় বাহির হইয়াছে। বিড়ালের গোঁফের মতই এই দুইটির সাহায্যে উহারা সম্মুখের জিনিস অনুভব করে। এই শুঁড় দিয়া উহারা ঘ্রাণ লয় এবং মক্ষিকার কানগুলিও এই শুঁড় দুইটিতেই আছে। এইগুলি দিয়া উহারা আপনাদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করে ও পথ খুঁজিয়া লয়।
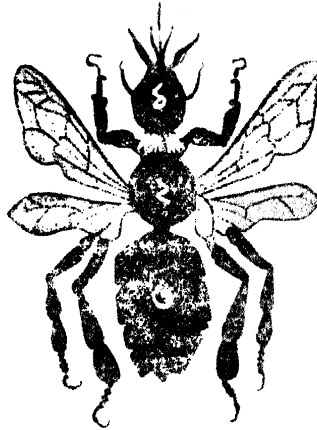
মৌমাছির ১। মাথা; ২। বুক; ৩। পেট

ইহাদের শুঁড় দুইটির গঠন আমাদের হস্ত পদের মত যুক্ত। শুঁড়ের শীর্ষাংশে দীর্ঘ ও পাতলা লোম ও ক্ষুদ্রাংশে ছোট ছোট ঘন লোম জন্মায়। প্রতি শুঁড়ে এইরূপ ১৪০০০ লোম আছে এবং প্রতি লোমটির একটি স্নায়ুর সহিত সম্পর্ক থাকায় মৌমাছি অন্ধকারে যাতায়াত বা কাজ করিতে পারে। প্রতি লোমটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর হওয়ায় কোমলতম স্পর্শটি পর্য্যন্ত মৌমাছি জানিতে পারে। শ্রমিক মৌমাছির প্রতি শুঁড়ে ২৪০০, গর্ভধারিণীর কিছু কম, কিন্তু বাবুদিগের ৩৭০০০ করিয়া ছিদ্র আছে। এইগুলিই উহাদিগের নাকের ফুটা।

শ্রমিক ও রাণীর খাটুনির জন্য নিশ্বাস ফেলিবার সময় কম ও বাবুদিগের অখণ্ড অবসরে নিশ্বাস ফেলিবার সময় যথেষ্ট বলিয়াই কি এই ব্যবস্থা?

মৌমাছির জিহ্বাটি ছুঁচাল। শ্রমিকের জিহ্বায় একশত সারি লোম, রাণী ও বাবুদিগের জিহ্বায় লোম কিছু কম। এই লোমশ জিহ্বা দিয়াই মৌমাছি ফুল হইতে মধুকণা সংগ্রহ করে। মৌমাছি আপন ছুঁচের মত লোমশ জিহ্বাটি ফুলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া বাহির করিয়া লইলে উহার জিহ্বার লোমে মধুর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাগুলি লাগিয়া থাকে।

মৌমাছির দাঁতও বেশ তীক্ষ্ণ ও দৃঢ়। কোন ফুলের মধুভাণ্ডারে জিহ্বা না পৌঁছিলে দাঁত দিয়া মৌমাছি একটি ক্ষুদ্র গর্ত্ত করিয়া ফেলে, তাহার পর জিহ্বা দিয়া মধু টানিয়া লয়। দাঁত দিয়া কাগজের বাক্স কাটিয়া মৌমাছি বাহির হইতে পারে।

মৌমাছির দেহ কাঁটার মত লোমে ঢাকা। মৌমাছি ফুলের মধ্যে প্রবেশ করিলে ফুলের রেণু ঐগুলিতে আটকাইয়া যায়। এই রেণুই পুষ্পবৃক্ষের বীজ সৃষ্টি করে। মৌমাছি উড়িয়া অন্য ফুলে বসিলে ঐ রেণু এই ফুলের রেণুর সহিত মিলিত হয়। পূর্ব্বোক্ত রেণু পুরুষ বীজ এবং শেষোক্ত রেণু স্ত্রী-ডিম্ব হইলে মৌমাছির ঘটকালিতে উভয়ের সম্মিলনে নূতন পুষ্পবৃক্ষের বীজ জন্মায়।

মৌমাছি পতঙ্গ জাতীয় এবং পতঙ্গ মাত্রই ষড়পদ। তিন জোড়া পা, ইহারা হাত ও পা উভয় রূপেই ব্যবহার করে। তৃতীয় জোড়া পায়ে অতি ক্ষুদ্র ঝুড়ির মত থাকে, এই ঝুড়িগুলিতে মৌমাছি ফুলে ফুলে মধুসংগ্রহের সময় রেণুও সংগ্রহ করিয়া মৌচাকে লইয়া যায়।

মৌমাছির পাখার ব্যবস্থা অদ্ভুত। দুইজোড়া পাখায় উড়িবার অসুবিধা হয়, সেইজন্য প্রতি পাশে দুইটি পাখা জুড়িয়া একটি করিবার জন্য পাখায় কয়েকটি হুকের ব্যবস্থা আছে। পাখার হুকে হুকে আঁটিয়া দুইটি পাখা একটি করিয়া লইয়া পাখা দৃঢ়ও হয় এবং উড়িবার পূর্ব্বোক্ত অসুবিধাও দূর হয়। আবার পাখার যখন প্রয়োজন নাই, তখন ঐ ব্যবস্থায় ঐগুলিকে গুটাইয়া লওয়াও সহজ।

মৌমাছির দুইটি উদর। একটি মধুভাণ্ড, অপরটি প্রকৃত উদর। মৌমাছি ফুল হইতে মধু চুষিয়া মধুভাণ্ডে রাখে। এই মধুভাণ্ড হইতে একটি সরু শোষণ নল গিয়া উদরে মিশিয়াছে। ফুল হইতে সংগৃহীত মধুতে কিছু কিছু রেণু থাকিয়া যায়। মধুভাণ্ড হইতে উদরে মধু যাইবার সময় রেণুগুলি লোমে ছাঁকিয়া থাকিয়া যায়। উদরে খাঁটি মধুমাত্র গিয়া পৌঁছে। তাহার পর উদর হইতে খাঁটি মধু আবার মৌমাছি মধুভাণ্ডে লইয়া আসে। মধু হইতে রেণু ছাঁকিবার এই অদ্ভুত কৌশলের জন্য মৌমাছির দুইটি পেটের ব্যবস্থা। মধুভাণ্ডে অতি অল্পই মধু ধরে; তিনটি মধুভাণ্ডের মধু একত্র করিলে আমাদের এক ফোঁটা মাত্র মধু হয়।

মৌমাছির সারা দেহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। এইগুলি দিয়া উহারা নিশ্বাস গ্রহণ করে। ইহার আত্মরক্ষার জন্য হুলের ব্যবস্থা। একটি কাঁটাযুক্ত খাপে দুইটি তীক্ষ্ণ সূচের মত যন্ত্র থাকে। এই হুল ক্রমাগত ফুটাইয়া গর্ত একটু গভীর করিবার পর বিষের থলি হইতে বিষ ঐ ক্ষতস্থানে ঢালিয়া দেয়। এই বিষের জ্বালায় আক্রান্ত জীব তখন অস্থির হইয়া পড়ে। এই বিষের জ্বালা কিন্তু মৌমাছির পক্ষে মারাত্মক। অন্য মৌচাক হইতে অনেক সময় চোর মৌমাছি মধু চুরি করিতে আসে। দ্বারী মৌমাছি ঠিক উহাকে ধরিয়া ফেলে এবং এমন হুল ফুটায় যে তৎক্ষণাৎ উহার মৃত্যু ঘটে।

মৌমাছি তাড়া করিয়া কাহাকেও আক্রমণ করে না। মুখে বা গায়ে বসিলে উহাকে না মারিলে উহা কিছুই করিবে না, কিছুক্ষণ পরে আপনি উড়িয়া যাইবে। কিন্তু কোন কারণে বিরক্ত বা ভীত হইলে আর রক্ষা নাই, তখন হুলের জ্বালায় অস্থির হইতে হইবে।

মৌপুরীর ব্যবস্থা

একটি মৌচাক বা মৌপুরীতে ত্রিশ হইতে ষাট হাজার পর্য্যন্ত মৌমাছি বাস করে। এই বিশাল পুরীর প্রতি মৌমাছিটির কর্ত্তব্য নিখুঁত ভাবে নির্দ্দিষ্ট করা আছে। উহারা জন্মাবধি এমন সুসংবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ, যে কোথাও কোন গোলমাল হয় না, সকলেই আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নিঃশব্দে করিয়া যায়।

মৌপুরীতে কাজ অনেক। একদল ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া আনে, আর এক দল পায়ে বাঁধা ঝুড়ি ভরিয়া আনে ফুলের রেণু, ভাঁড়ারীর দল ভাঁড়ার লইয়া ব্যস্ত। একদল পুরী পরিষ্কার রাখিবার জন্য ব্যস্ত। একদল পুরীর পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনে লাগিয়াই থাকে। মৌ-সঙ্ঘে রাসায়নিকেরও অভাব নাই। এমন কি মৃতদেহ সৎকার করিবার জন্যও একদল প্রস্তুত থাকে। পাছে মৌপুরী হইতে অতি কষ্টে সঞ্চিত মূল্যবান মধু কোন চোর মৌমাছি আসিয়া চুরি করে, তাহার জন্য পুরীদ্বারে দ্বারীর পর্য্যন্ত ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। মৌ-সঙ্ঘের ব্যবস্থা অতি নিখুঁত।

মৌ-সঙ্ঘের অদ্ভুত কথার এক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এইবারে দিবার চেষ্টা করিব। মৌ-সঙ্ঘের প্রথম কাজ একটি মৌচাক বা মৌপুরী গঠন করা। মৌপুরীর ঘরে ঘরে সংঘ জননী (Queen Bee) ডিম পাড়িলে, ঐগুলিকে সযত্নে ফুটাইয়া সংঘের সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার একদল ধাত্রী মৌমাছি নিযুক্ত হয়। শত ফুলে বসিয়া এককণা মধু সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ভাঁড়ারে সঞ্চয় করা—ইহাও একটি প্রধান কাজ।

মৌপুরীর গঠন

মৌ-পুরীর গঠনের জন্য মোম দরকার। ইহা মৌমাছিরা প্রস্তুত করিয়া লয়। মৌমাছির উদর ছয়টি খাঁজে গঠিত। এই খাঁজগুলির তলে আটটি থলি থাকে। মৌমাছির এক প্রকার রস ক্ষরণ হয়, ঐ রসের সহিত মধু মিশাইলে মোম প্রস্তুত হয়। প্রয়োজন হইলে মৌমাছির দল মধু হইতে মোম প্রস্তুত করিয়া লয়।

মোম যে তরল অবস্থায় প্রস্তুত হয়, উহার জন্য ৮৭° হইতে ৯৮° তাপমাত্রা প্রয়োজন। মৌমাছির দল এক জায়গায় জড় হইয়া ঐরূপ তাপ সৃষ্টি করে। তরল মোম শীতল হইলে দেখা যায় পাতলা আঁশের মত করিয়া ঢালা হইয়াছে এবং ঐগুলি উদর চক্রের তলদেশের থলি হইতে বাহির হইয়া আসে। এইগুলি দেখিতে ঠিক অভ্রের পাতার মত। মৌমাছির পিছনের পা দুটির চিমটার

১। মৌপুত্রীর কক্ষের গঠন আরম্ভ হইল

২। প্রথমে কক্ষটি গোলাকার হইল

৩। ক্রমশঃ উহাকে ছয়-কোণা করা হইতেছে

৪। কতকগুলি ছোট ঘর ভাঙ্গিয়া সংঘ-জননীর জন্য বড় ঘর প্রস্তুত হইতেছে

৫। এটির নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছে

৬। ধাত্রী মৌমাছি একে একে ডিমগুলি লইয়া এক-একটি ঘরে রাখিতেছে

মত ধরিবার ব্যবস্থা আছে। উহা তখন আপন পিছনের পায়ের চিমটা দিয়া মোমের পাত ধরিয়া মুখে ফেলিয়া দেয়। তখন উহা মোমকে চিবাইয়া ভাল করিয়া মুখের লালার সহিত মিশাইয়া মৌপুরী গড়িবার উপযুক্ত মসলা প্রস্তুত করে।

মৌচাকের উপরে যে মৌমাছিগুলি বসিয়া থাকে উহাদের কাজই হইল মৌপুরী গড়িবার ঐরূপ মসলা প্রস্তুত করা। মৌমাছির দল নির্বাক হইয়া মৌপুরীর গঠন ও সংস্কারের মসলা প্রস্তুতে অবিরাম ব্যস্ত থাকে।

এই মসলা পাইয়া রাজ-মজুরের দল পুরীর গঠনে লাগিয়া যায়। একটি একটি করিয়া মোমের পাত জুড়িয়া উহারা মৌপুরীর প্রথমে ছাদ প্রস্তুত করে। আমরা গড়ি নিম্ন হইতে উপরের দিকে, উহারা গড়ে উপর হইতে নিম্ন দিকে। মৌমাছির দল মোমের পাত একটির পর একটি যেমন যোগাইয়া যায়, রাজ-মজুরের দলও ঐগুলিকে জুড়িয়া জুড়িয়া সমষড়বাহু ঘর প্রস্তুত করিয়া যায়।

এই সমষড়বাহু ঘরের প্রধান বিশেষত্ব যে ইহাতে প্রচুর স্থান পাওয়া যায়, মৌপুরীর কোথাও ফাঁক থাকে না এবং খুব দৃঢ় হয়। আর কোন প্রকার ঘরে এতগুলি সুবিধা লাভ সম্ভব হবে। গোলাকার কক্ষ হইলে মৌচাকে ফাঁক থাকিয়া যায়, আবার চতুর্ভুজ কক্ষ হইলে ফাঁক থাকে না বটে, কিন্তু তেমন দৃঢ় হয় না। ক্রমশঃ মোমের পাতের যোগান বাড়িতে থাকে, ফলে ঘরের সংখ্যাও তাড়াতাড়ি বাড়িয়া চলে।

সংঘ জননী বা বাবু মৌমাছির দেহে মোম প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা নাই, সেই জন্য উহারা পুরীগঠনের কোন অংশই গ্রহণ করে না। দশ পনের সের মধু হইতে এক সের মাত্র মোম প্রস্তুত হয়। কত লক্ষ বার যাতায়াতে কণা কণা মধু সংগ্রহ করিলে একটি বড় মৌপুরী গঠিত হইতে পারে! কত মৌমাছির দলকে কত না কঠোর পরিশ্রমই করিতে হয়।

মৌপুরীর অধিকাংশ কক্ষ শ্রমিক মৌমাছি পালনের জন্য প্রস্তুত হয়। এই ঘরগুলি ছোট, এক ইঞ্চির প্রায় এক পঞ্চমাংশ। বাবু-মৌমাছির জন্য তিন চারটি মাত্র অপেক্ষাকৃত বড় ঘর প্রস্তুত করা হয়। সংঘ-জননীদিগের জন্য যে

ঘরগুলি প্রস্তুত হয়, সেগুলি বেশ বড় হয় এবং উহাদিগের প্রবেশপথ থাকে নিম্নদিকে। ছোট ছোট ঘরগুলি ভাঙ্গিয়া ঐরূপ বড় ঘর প্রস্তুত হয়।

সংঘ-জননীর কার্য্য

মৌপুরী নির্ম্মাণের আরম্ভ কালে সংঘ-জননী মৌপুরীর উপরে এলোমেলো ভাবে উড়িয়া বেড়ায়। কারিগরেরা যথেষ্ট ঘর প্রস্তুত করিয়া ফেলিলে সংঘ-জননী ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। সংঘ-জননী কতকগুলি সহচরীর সহিত উড়িয়া আপন মনোমত একটি কক্ষে গিয়া প্রথম ডিমটি পাড়ে।

সহচরীরা চক্রাকারে সংঘজননীকে ঘিরিয়া থাকে। সংঘ-জননী ঘরে ঘরে একটি করিয়া ডিম পাড়িয়া যায়। তাহার দিবারাত্র ধরিয়া ঘরে ঘরে একটি করিয়া ডিম পাড়িয়া যাওয়াই একমাত্র কর্ত্তব্য। সহচরীরা তাহার সেবায় দিবারাত্র নিযুক্ত থাকে, তাহারা তাহাকে সময় মত খাওয়াইয়া দেয়, পরিষ্কার করিয়া দেয়, এমন কি উহারা পিঠ ধীরে ধীরে চাপড়াইয়া সংঘ-জননীকে ডিম পাড়িবার সময় সাহস দেয়।

এখন কারিগর ও সংঘ-জননীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। কারিগরেরা অধিকতর তৎপর না হইলে পাড়া ডিম রাখিবার আর ঘর পাওয়া যায় না। ক্রমশঃ মৌপুরীর প্রতি ঘরে একটি করিয়া ডিম পাড়া হয়। তিন চারি দিনে ডিমগুলি ফুটিতে আরম্ভ করে। প্রথম পাড়া ডিমগুলি ফুটিতে আরম্ভ করিলে ধাত্রী মৌমাছিদের কাজ বাড়ে।

মৌমাছির ডিমের ক্রমবিকাশ

প্রথমে ডিম ফুটিয়া মৌমাছিটি বাহির হইলে তাহাকে দেখিতে হয় কীটের মত, উহাদিগকে খাওয়ান ও পরিষ্কার রাখাই ধাত্রীর কর্ত্তব্য। প্রথমাবস্থায় ইহারা মৌমাছির সাধারণ আহার গ্রহণ করিতে পারে না, তখন ইহাদিগকে ধাত্রীরা আপন দেহ হইতে এক প্রকার রস বাহির করিয়া খাইতে দেয়। আমাদের মায়েদের দুধের মত এই রসকে মৌদুগ্ধ বলিলে ভুল হইবে না।

মধু পান করিয়া ধাত্রীগণ আপন দেহে ঐ মধুকে রসে পরিণত করিয়া মৌমাছির ছানাগুলিকে খাইতে দেয়।

তিন দিন ধরিয়া ঐ মৌদুগ্ধে মৌকীটকে পালন করিবার পর দুগ্ধের পরিবর্ত্তন ঘটে। তখন ধাত্রীগণ অধিকতর পুষ্টিকর ও গাঢ় রস দেহে জন্মাইয়া বাড়ন্ত
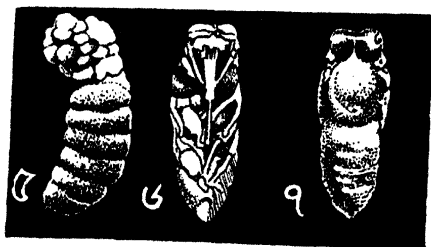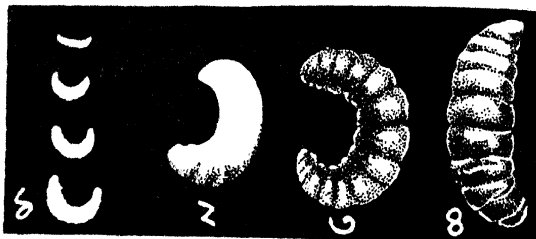
ডিম হইতে মৌকীটের ক্রমবিকাশ

মৌকীটকে খাইতে দেয়। এই গাঢ় রস পান করিয়া মৌকীট তাড়াতাড়ি বাড়িতে থাকে; এই সময়ে ইহারা মাঝে মাঝে খোলস ছাড়িয়া নূতন আবরণ গ্রহণ করে।

মৌকীট পূর্ণাঙ্গ হইলে, কারিগর আসিয়া উহার ঘর মোমের পাত দিয়া বন্ধ করিয়া দেয়। এই সময় পূর্ণাঙ্গ মৌকীট আপনার চারিদিকে রেশমসূতার

খোল বুনিয়া গুটিতে (Chrysalis) পরিণত হইতে থাকে। ইহার পর হইতেই উহার দেহে নানা পরিবর্ত্তন দেখা দেয়।

ক্রমশঃ গুটি দেহে মৌমাছির মাথা দেখা দেয়, মুখ রূপ গ্রহণ করে এবং মাথা, গলা ও পেটের সীমা রেখা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। দেহ হইতে ছোট ছোট অঙ্কুরের মত বাহির হইয়া তিন জোড়া পা ও গোঁফে পরিণত হয়। তাহার পর পাখা চারিটি দেখা দেয়। শেষে চক্ষু জন্মায় এবং কীটের শ্বেতবর্ণ মৌমাছিরূপে রঞ্জিন হইয়া উঠে। ঘরের দ্বার বন্ধ হইবার ১৬ দিনের মধ্যে মৌকীট পূর্ণাঙ্গ মৌমাছিতে পরিণত হইয়া মৌসংঘের কাজের অংশ লইবার জন্য প্রস্তুত হয়।

সদ্যোজাত পূর্ণাঙ্গ মৌমাছি

এইবারে পূর্ণাঙ্গ মৌমাছি তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়া মোমের দ্বারে একটি ছিদ্র করিয়া ফেলে এবং ঐ ছিদ্রপথে একটি গোঁফ বাড়াইয়া দিয়া পথের পরিচয় লইবার চেষ্টা করে। তাহার পর কাটিয়া কাটিয়া ফুটাটি বড় করিয়া ফেলে এবং প্রায়ই ধাত্রীদিগের সাহায্যে ঘরের বাহিরে আসে। ধাত্রীগণ তখন তাহাকে পরিষ্কার করিয়া দিয়া খাইতে দেয়।

কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সদ্য আগত মৌমাছিটি ধাত্রীদিগের সহিত নূতন নূতন ফোটা কীটের সেবায় লাগিয়া পড়ে। দুর্ব্বল শিশু মৌমাছির জন্য পুরী মধ্যেই লঘু কার্য্যের ব্যবস্থা। কয়েক সপ্তাহ সেবা কার্য্য করিবার পর মধু সংগ্রহকারীদিগের সহিত ফুল হইতে ফুলে উড়িয়া উড়িয়া মধু লইয়া আসিয়া উহারা মৌপুরীর ভাঁড়ারীদিগের হাতে তুলিয়া দিতে থাকে।

বাবু-মৌমাছি

বাবু মৌমাছিদিগের জন্মকথা শ্রমিকদিগের মত ; কেবলমাত্র ডিম হইতে পূর্ণাঙ্গ বাবু মৌমাছিতে পরিণত হইতে সময় লয়। বাবুরা অলস, উহাদিগের পূর্ণাঙ্গ হইতে কিছু বেশী সময় লাগে।

সংঘ-জননীর জন্ম

সংঘ জননীদের জন্ম কথায় একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কারিগরেরা মৌপুরীতে তিন চারিটি বড় ঘর ভবিষ্যৎ সংঘ-জননীদিগের জন্য প্রস্তুত করে। এই ঘর-গুলিতে আলো বাতাস প্রবেশ করিবার বেশ ভাল ব্যবস্থা থাকে।

ঘরগুলি প্রস্তুত হইয়া গেলেই একটি করিয়া ডিম লইয়া ধাত্রীরা ঐ ঘর-গুলিতে রাখে। ঐ ডিমগুলির বয়স তখন তিন দিনের বেশী নয়। চারিদিন পরে প্রথম ডিমটি হইতে কীট জন্মায়, তাহার পর এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। সাধারণ মৌভক্ষ না দিয়া, উহাদিগকে এক প্রকার বিশেষ পুষ্টিকর রস পান করান হয়। নবম দিনে কীটগুটির রেশম বুনিয়া লইলে উহার গৃহদ্বার পূর্ব্বের মত বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এক সপ্তাহ পরে শিশু সংঘ-জননী ঘর ছাড়িবার উপযুক্ত হয়। পূর্ণাঙ্গ সংঘ-জননী দ্বার কাটিয়া ঘর হইতে বাহির হইলে ঐ বৃহৎ ঘর হইতে পূর্ব্বের মত কতকগুলি ছোট ঘর কারিগরেরা গড়িয়া তুলে।

সংঘ-জননীর হিংসা

সাধারণ ডিম হইতে কেবল মাত্র বিশেষ আহার্য্যের গুণে কি করিয়া শিশু সংঘ-জননীর জন্ম হয়, এ কথা আজিও বৈজ্ঞানিক বুঝিতে পারেন নাই। প্রাচীনা সংঘ-জননী নবাগতদিগকে সহচরীদের সাহায্যে বহুক্ষেত্রে মারিয়া ফেলে। ইহাতে শ্রমিকদিগের সম্মতি থাকে। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় নবীনা সংঘ-জননী কার্য্যের উপযুক্ত হইলে প্রাচীনাকে ধরিয়া না রাখিলে উহা আসিয়া নবীনাকে আক্রমণ করে। শ্রমিকদিগের মধ্যস্থতায় প্রাচীনা আক্রমণ করিতে

না পারিলে, সে কতক শ্রমিক ও কয়েকটি বাবু-মৌমাছি লইয়া উড়িয়া চলিয়া যায় এবং নূতন স্থানে এক নূতন মৌপুরী গড়িয়া তুলে।

মৌমাছির দূতীয়ালী

বসন্তকালে যখন সারা দেশ ফুলে ছাইয়া ফেলে তখনই আরম্ভ হয় মৌমাছিদিগের কাজ। ফুলে ফুলে উড়িয়া বসিয়া উহারা মধু ও রেণু সংগ্রহ করে, আবার পুরুষ-ফুলের রেণু স্ত্রী-ফুলের ডিম্বকোষে মাখাইয়া দিয়া নূতন ফুলগাছের সৃষ্টির উপলক্ষ হইয়া বেড়ায়। মৌমাছির এরূপ ঘটকালি একটা আকস্মিক সংঘটন মাত্র, কিন্তু প্রকৃতি দেবী একজনের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে গিয়া দুইটি অচল জীবের মিলনের উপায় করিয়া দিয়াছেন। (বিচিত্র এই সৃষ্টি দেখ)

মৌমাছির জীবনযাত্রা

মৌমাছির মধুভাণ্ডে এক ফোঁটা মধুর মাত্র এক তৃতীয়াংশ ধরে। কখন কখন মৌমাছটিকে ৬ই তিন মাইলও উড়িয়া গিয়া মধু সংগ্রহ করিতে হয়। এইরূপ ফোঁটা ফোঁটা করিয়া আধ-মণি মৌচাক গঠন ও উহার মধুভাণ্ড পূর্ণ করিতে কি অসম্ভব পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার ধারণা করা যায় না।

মৌমাছির দল জীবনে বিশ্রাম জানে না। উহারা কাজে এমন আনন্দ পায় যে বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। ফুলের মধু আকের রসের (Cane sugar) মত, অপেক্ষাকৃত দুষ্পাচ্য। এই রসে আপন উদর পূর্ণ করিয়া ছুটিয়া আসিবার কালে উহা দেহের রসের সহিত মিলিয়া আঙ্গুর রসে বা মধুতে (Grape sugar) পরিণত হয়। এই রস সুপাচ্য ও পুষ্টিকর।

মৌমাছি মধু বা রেণু লইয়া ফিরিয়া আসিলে ভাঁড়ারীর সঙ্গে দেখা হয়। সে আনীত মধু পেট হইতে বাহির করিয়া ভাঁড়ারীর মুখে তুলিয়া ধরে। সে ঐ মধুকণা গিলিয়া ফেলিয়া কোন এক খালি ঘরে ছুটিয়া গিয়া রাখিয়া আসে। যে মধু আনিয়াছিল সে পুনরায় মধুর সন্ধানে ছুটে।

লক্ষ্য করিলে মৌপুরীর বাহিরে ও ভিতরে মৌমাছিদিগের অদ্ভুত কর্ম-

তৎপরতা চোখে পড়ে। বাহির হইতে শত শত ফুলের রেণু ও মধুর ভার লইয়া মৌমাছির দল ছুটিয়া আসিতেছে, আবার ভাঁড়ারীকে দিয়াই নূতন রসদের সন্ধানে ছুটিয়া চলিয়া যাইতেছে। বিশ্রামের কোন প্রশ্নই উঠে না। ভার লইয়া দ্বারীর সম্মুখ দিয়া মৌপুরীতে প্রবেশ করিবার সময় বরং ধীরে ধীরে উহারা যায়, কিন্তু ভার নামাইয়া আর বিলম্ব করে না, একেবারে সোজা উড়িয়া চলিয়া যায়। যাহারা মৌপুরী হইতে উড়িয়া যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি যেন উড়িতে ইতস্তত: করে। ইহারা সাথীদিগের সঙ্গে এই প্রথম বাহিরে যাইতেছে মধু সংগ্রহের চেষ্টায়, তাই বিশাল মুক্ত আলোক-ভরা আকাশ দেখিয়া তাহাদের একটা ইতস্তত: ভাব।

পুরীদ্বারে দ্বারী সারাক্ষণ পাহারা দিতেছে। সকল মৌমাছিকেই উহাদিগের সম্মুখ দিয়া আসিতে হয়। উহারা আপন পুরীবাসীদিগকে বেশ চিনে; অন্য পুরীর চোর-মৌমাছি বা কোন বোলতা মধুসংগ্রহের আশায় যদি পুরী মধ্যে পুরীবাসীদিগের সহিত প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। উহা দ্বারীদিগের সতর্ক দৃষ্টি কিছুতেই এড়াইয়া যাইতে পারিবে না, ধরা পড়িবেই এবং ধরা পড়িলেই হুলের ঘায়ে মারা পড়িবে।

পুরীদ্বারে কতকগুলি মৌমাছিকে দ্বারের দিকে মুখ করিয়া অনবরত সজোরে পাখা নাড়িতে দেখা যায়। ইহারা এত জোরে পাখা নাড়ে যে, বিমানের পাখার মত পাখাগুলিকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের কাজ মৌপুরীর গরম বাতাস বাহির করিয়া দিয়া মৌপুরীকে শীতল রাখা, কারণ অতিশয় তাতিয়া উঠিলে মোমে নির্মিত মৌপুরী গলিয়া পড়িতে পারে। ইহারা এত জোরে পাখা নাড়ে যে নিকটে জলন্ত মোমবাতি ধরিলে নিভিয়া যায়। গরমকালে অবিরাম রাত্রিদিন পাখা নাড়িয়া মৌপুরীর ভিতরের গরম বাতাস বাহির করিয়া দিতে হয়। এই কারণে মৌমাছির দল পালা করিয়া নিযুক্ত হয়। একদল ক্লান্ত হইয়া পড়িলে উহাদের স্থান আর একদল আসিয়া লয়; তখন ক্লান্ত দল বিশ্রাম করে।

মৌমাছিদের মৌপুরীতে নানা জাতীয় ফুলের রেণুর প্রয়োজন হয়। উহারা

ঐগুলি যত্নে সংগ্রহ করে। অদ্ভুত সংস্কারে উহারা প্রয়োজনমত নানা জাতীয় রেণু খুঁজিয়া লইতে পারে। দুই একটি ফুলে উড়িয়া বসিলেই উহাদের পায়ের লোমে ফুলের রেণুগুলি লাগিয়া যায়। মৌমাছি লোমশ পাগুলিকে আবার চিরুণীরূপে ব্যবহার করিতে পারে। পায়ের লোমে লাগা ফুলের রেণুগুলি পা-চিরুণী দিয়া মৌমাছি আঁচড়াইয়া একস্থানে জড় করে এবং একফণা মধু দিয়া মাখিয়া পায়ে-বাঁধা ঝুড়িতে রাখে। রেণুখণ্ডে পায়ের ঝুড়িগুলি এইরূপে পূর্ণ হইলে মৌমাছি উড়িয়া মৌপুরীতে ফিরিয়া যায়।

রেণু বহিয়া আনিয়া মৌমাছি এত ক্লান্ত হইয়া পড়ে যে উহাকে অন্য মৌমাছির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। সে ধীরে ধীরে রেণু রাখিবার ভাঁড়ারে গিয়া রেণুর মণ্ডগুলি রাখিয়া দেয়। একই ঘরে প্রতিবারেই একই রকম রেণু রাখে, এক প্রকার রেণুর ঘরে অন্য প্রকার রেণু কিছুতেই রাখে না; এবিষয়ে মৌমাছিদের কিছুতেই ভুল হয় না। রেণুর ভার রাখিয়াই তাহারা আবার রেণু বা মধু আনিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

মধু ও রেণু ছাড়া এক প্রকার গাছের লাল আঠা মৌমাছিকে সংগ্রহ করিতে হয়। যে গাছে এইরূপ লাল আঠা পাওয়া যায়, সে সকল গাছে উড়িয়া গিয়া আঠাল পদার্থকে টানিয়া সূত্রাকারে জড়াইয়া পায়ের ঝুড়িতে ভরিয়া লইয়া আসে। এই সকল মৌমাছি মৌপুরীতে ফিরিয়া আসিলেই মৌমাছির দল তাড়াতাড়ি আঠার ভার জমাট বাঁধিবার পূর্ব্বেই নামাইয়া লয়। তাহার পর উহারা ঐ আঠা তীক্ষ্ণ দাঁতে চিবাইয়া মুখের লালার সহিত মিশাইয়া এক প্রকার বার্ণিশ প্রস্তুত করে। পুরী নূতন হইলে উহার ভিতর-বাহির এই বার্ণিশ দিয়া রং করে এবং পুরীর যেখানে ফাট ধরে সেইস্থানে ঐ বার্ণিশ দিয়া জুড়িয়া দেয়।

এই বার্ণিশ দিয়া উহারা আর একটি কার্য্যোদ্ধার করে। দৈবাৎক্রমে ক্ষুদে ইঁদুর বা একটি বড় গুবরে পোকা মৌপুরীতে প্রবেশ করিলে মৌমাছির পাল উহাকে ভয়ঙ্কররূপে আক্রমণ করে ও মারিয়া ফেলে। তখন এই মৃতদেহ

লইয়া বিপদ। ঐ বিশালদেহ মৌপুরী হইতে সরাইয়া ফেলা ক্ষুদ্র মৌমাছিদের শক্তিতে কুলায় না। অথচ পুরীমধ্যে ঐ মৃতদেহ পচিলে পুরীর সঞ্চিত মধু নষ্ট হইয়া যাইবে এবং মৌমাছির দলকে পুরী ত্যাগ করিতে হইবে। সেইজন্য এই মৃতদেহে আগাগোড়া ঐ বার্নিশের সহিত মোম মিশাইয়া মাখাইয়া দিলে উহা সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য খোলে আবদ্ধ থাকে বলিয়া পচিতে পায় না।

কোন মৌমাছি বা কীট মরিয়া গেলে উহার মৃতদেহ বহিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিবার জন্য একদল মৌমাছি নিযুক্ত থাকে। প্রয়োজনমত জল বহিয়া আনিবার জন্য একদল মৌমাছি নিযুক্ত হয়। উহারা জল সঞ্চিত রাখে না, প্রয়োজন হইলে বহিয়া লইয়া আসে।

মৌপুরীতে একদল মৌমাছি রাসায়নিকের কার্য্য করে। কোন ঘর মধুপূর্ণ হইয়া গেলে, ঐ ঘর মোম দিয়া বন্ধ করিবার পূর্ব্বে রাসায়নিক-মৌমাছি আসিয়া আপন হুলের নিকটস্থ বিষের থলি হইতে এক কণা ফরমিক য়্যাসিড (Formic Acid) লইয়া উহাতে মিশাইয়া দেয়। ঐ ঔষধের গুণে মধু গাঁজিতে পায় না।

মৌমাছির মধু সঞ্চয় মানুষের জন্য নয়। মানুষ ঐ মধুর অস্তিত্ব জানিতে পারিলে চুরি করিয়া লয়। শীতাগমে ফুলের অভাব হইলে খাদ্যের অভাব হইবে—এইজন্য মৌমাছিরা বসন্তকালে প্রচুর মধু মৌপুরীর ঘরে ঘরে সঞ্চয় করে। শীত আসিলে কারিগর মৌমাছির দল একটিমাত্র সংকীর্ণ পথ রাখিয়া মৌপুরীর দ্বারগুলি মোম দিয়া বন্ধ করিয়া দেয়। তাহার পর অধিকাংশ মৌমাছি বংশ-জননীকে ঘিরিয়া দিন কাটায়। এক সঙ্গে এতগুলি মৌমাছি একস্থানে থাকায় মৌপুরী বেশ গরম থাকে, এই গরমে মৌমাছিদিগের কোন কষ্ট হয় না। বাহিরের মৌমাছিগুলি মাঝে মাঝে ভিতরে আসিয়া আপনাদিগকে গরম করিয়া লয়। শীতকালেও বাহিরের কর্ত্তব্য শেষ হয় না। মৌপুরীর উপরে পায়ে পায়ে বসিয়া উহারা মৌপুরীকে গরম করিয়া আবাসযোগ্য করিয়া তুলে।

১৩

মাকড়সা

পোকা ও মাকড়ে প্রভেদ

মাকড়সা পোকা হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত। পোকা ও মাকড়ে তফাৎ অতি সুস্পষ্ট। পোকার মাথা, বুক ও পেট তিনটি অঙ্গ সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে বিভক্ত, কিন্তু মাকড়ের মাথা ও বুক এক সঙ্গে যুক্ত থাকে, সেই জন্ম উহার দেহের মাথা ও পেট মাত্র সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিতে পড়ে। পোকা ও মাকড়ের আর একটি প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ণাঙ্গ পোকার ছয়টি পা, কিন্তু মাকড়ের, উই ও কাঁকড়া বিছার মত, আটটি পা।

মাকড়ের পোকা শিকার

ইহারা পোকা জাতির মহাশত্রু। মাকড় রাত্রিদিন ওৎ পাতিয়া আছে, সুযোগ পাইলেই শিকারের উপর লাফাইয়া পড়ে এবং উহার রক্ত চুষিয়া খাইয়া মৃত দেহটি ফেলিয়া দেয়।

পৃথিবীর সকল অংশেই মাকড় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার জাল দেখিলে মনে হয়—একরাশি সূতা জোট পাকাইয়া গিয়াছে; প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। লক্ষ্য করিয়া দেখিলে জালের মধ্যস্থলে একটি ঘন সূতায় বোনা নল চোখে পড়ে। এই নলে মাকড়-গৃহিণী ও তাহার সহচরটি সুখে বাস করে। সময় হইলে মাকড় গৃহিণী গুটিগুচ্ছ ডিম পাড়ে, এবং কয়েকটি গুটি একটি রেশমের নলে পুরিয়া রাখে। এই নলের একপ্রান্ত কেন্দ্রে রাখিয়া মাকড় আপন শিকার ধরিবার জালটি বোনে।

আপন ইচ্ছামত উড়িতে উড়িতে জালে মাছির পা আটকাইয়া পড়িলে,

কায়ের সুতাগুলি কিছু মোটা দেখিতে। এই সুতায় পোকা ধরিবার এক প্রকার আঠা মাখাইয়া দেয় বলিয়া উহাকে অপেক্ষাকৃত মোটা দেখায়। হতভাগ্য মাছি বা অন্য কোন পোকা এই জালে পড়িলে ঐ আঠায় উহার পা জড়াইয়া ধরে, তাহার পর মুক্তি পাইবার জন্য ধস্তাধস্তি করিতে গিয়া জালে বিষম ভাবে জড়াইয়া পড়ে।

এই জালের মধ্যদেশের সুতাগুলিতে আঠা মাখান থাকে না, ফলে মাকড় কেন্দ্রে বিশ্রাম করিবার সময় নিজের জালে নিজেই জড়াইয়া পড়ে না। উহার দেহ হইতে এমন এক তৈলাক্ত রস বাহির হয়, যাহার জন্যও উহা আপন আঠাল জালে জড়াইয়া পড়ে না।

আকারবর্দ্ধক যন্ত্র সাহায্যে জালটি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে জালের আঠা বড়ি-বড়ি হইয়া জালের গায়ে শুকাইয়া লাগিয়া আছে। আঠা শুকাইলে জাল আর তেমন শিকার ধরিতে পারে না, সেইজন্য মাকড় ঐ [illegible] পুরাতন জাল খাইয়া ফেলিয়া নূতন জাল বুনিয়া টাটকা আঠা মাখাইয়া র[illegible] একটি জাল বুনিতে মাকড়ের প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লাগে।

স্ত্রী ও পুরুষ-মাকড়

পুরুষ-মাকড়সা নারী অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার হয়। উহারাও ঐরূপ জাল [illegible]য়া শিকারের আশায় ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে। পুরুষ-মাকড়কে স্ত্রী-মা[illegible]র পিছু পিছু ঘুরিতে বা উহার সহিত খেলা করিতে দেখা যায়। [illegible] মাকড় স্ত্রী বিরক্ত হইলে আর রক্ষা নাই; পুরুষ-মাকড় তখন পলাই[illegible] প্রাণ বাঁচায়, ঐ সময় মাকড়-স্ত্রী বাগে পাইলে সহচরটিকে মারিয়া ফেলিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না।

মাকড়ের ছানা

গুটি ফাটাইয়া শত শত মাকড় ছানা বাহির হইয়া এক স্থানে জট পাকাইয়া থাকে। ঐ জটকে অন্য কিছু মনে করিয়া স্পর্শ করিবামাত্র ছানাগুলি ইতস্ততঃ

ছুটিয়া পলাইয়া যায়। আবার চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে দেখা যাইবে ছানাগুলি আবার একস্থানে আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় জট পাকাইয়া ঝুলিতেছে।

ছানাগুলি বাড়িবার মুখে মাঝে মাঝে খোলস ছাড়ে। নূতন চামড়া ক্রমশঃ শক্ত হইয়া বাড়ন্ত ছানার বাড়ের পক্ষে কষ্টকর হয়, তখন ছানাগুলি ঐ পুরাতন শক্ত চামড়া ফাটাইয়া এক কোমল চামড়া গায়ে বাহির হইয়া আসে। এইরূপ কয়েকবার খোলস ছাড়িয়া মাকড় পূর্ণাকার লাভ করে।

ইহার সূতা রেশমের মত মসৃণ ও দৃঢ়। সেইজন্য মাকড় পুষিয়া সূতা প্রস্তুতের চেষ্টা হয়। কিন্তু মাকড়ের প্রবৃত্তি রাক্ষসের মত। শেষে দেখা যায় আপনাদিগের মধ্যে এ উহাকে খাইয়া শেষে একটিমাত্র বাঁচিয়া আছে।

১৪

রক্তবীজের ঝাড়

ম্যালেরিয়া জ্বর

পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যত লোক যুদ্ধ, মড়ক, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি আধিব্যাধিতে মরিয়াছে, তাহার অর্দ্ধেক মরিয়াছে ম্যালেরিয়া জ্বরে। ইহার কারণ লোকে পূর্ব্বে ধরিতে পারিত না, এখন বিজ্ঞানের সাধনায় ইহার কারণ ধরা পড়িয়াছে। মানুষ চেষ্টা করিলে এখন ইহাকে দেশ হইতে একেবারে উচ্ছেদ করিতে পারে।

পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল দূষিত বায়ুর জন্য ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। জলাভূমিতে এই দূষিত বায়ু জন্মায়, সেইজন্য যেদেশে জল নিকাশের ভাল ব্যবস্থা নাই, যেদেশে খাল, বিল, পুকুর আদি জলাশয় মজিয়া উঠে, সেই সকল দেশে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ দেখা যেয়।

১৮৮০ খৃঃ একজন ফরাসী সামরিক চিকিৎসক আলজিরিয়ায় (Africa) থাকা কালীন আবিষ্কার করেন যে ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তে এক প্রকার প্রাণী-বীজ (Spores) জন্মায়। ইহার বৎসর তিনেক পরে ওয়াসিংটন (U. S. A.) নগরবাসী ডাঃ কিং বলেন যে, ম্যালেরিয়া-উৎপীড়িত স্থানে যথেষ্ট মশার উৎপাত ; তবে কি এই মশাই ঐ দূষিত জ্বরের মূল রক্তবীজের বাহন ? মানুষের মনে কৌতূহল জাগিল, নূতন পথে গবেষণা চলিল।

ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ

এই বিষয় চূড়ান্ত আবিষ্কারের জন্য স্যার রোনাল্ড রসের (Sir Ronald Ross) নিকট সমগ্র জগৎ ঋণী। তিনি ভারতেই চিকিৎসা বিভাগে চাকুরী করিতেন। এখানে এবিষয়ে গবেষণা করিবার যথেষ্ট সুযোগ। তাঁহার গবেষণার কল্যাণে মানুষ ইচ্ছা করিলে আজ নিজের দেশ ম্যালেরিয়া হইতে মুক্ত করিতে পারে।

প্রথম কথা : যে দেশে মশা প্রচুর সেই দেশে ম্যালেরিয়ার উৎপাত অধিক দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু কোন দেশে মশা থাকিলেই ম্যালেরিয়ার উৎপাত থাকিবে এমন কোন অর্থ নাই।

দ্বিতীয় কথা : যাহার ম্যালেরিয়া জ্বর হইয়াছে তাহার রক্তে এক প্রকার প্রাণী-বীজ (Spores) পাওয়া যায়।

তৃতীয় কথা : বসন্ত, খোস, পাঁচড়ার মত ইহা সংক্রামক নহে, বা ক্ষয়কাশ ইত্যাদি রোগের বীজের মত বীজ বায়ু-বাহিত নহে।

পৃথিবীতে সহস্র প্রকারের মশা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে এক প্রকারের নাম য়্যানোফিলিস (Anopheles)। কেবলমাত্র এই মশার কামড়ের পর ম্যালেরিয়া জ্বর দেখা দেয়। এই মশার নারী জাতির কামড়ই বিষাক্ত, পুরুষের কামড় নির্দ্দোষ। দিনে ইহারা বিশ্রাম করে, সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে জীবের রক্ত খাইতে বাহির হয়।

মশক জীবনের প্রথম পর্ব্ব

ইহারা সাধারণ মশারই মত স্রোতহীন নোংরা জলাশয়ে ডিম পাড়ে (১)। ইহাদের ডিমগুলি পৃথক পৃথক প্রতি ডিমটি একটি খোলে মোড়া থাকে (২)। জলে পড়িয়া এই খোলটি ফুলিয়া উঠে, সেইজন্য মশার ডিম জলে ভাসিয়া
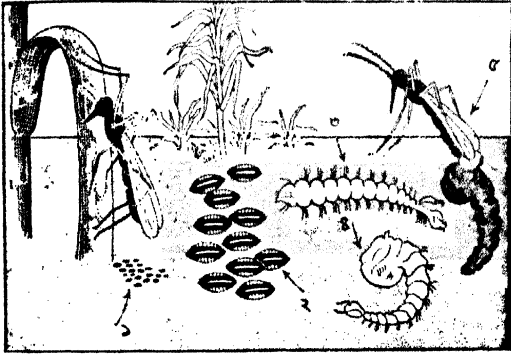
মশক জীবনের প্রথম পর্ব্ব

থাকে। দুই তিন দিনের মধ্যেই ডিম ফুটিয়া মশক-কীট (Larvae বাহির হইয়া জলে কিলবিল করিতে দেখা যায় (৩) এই অবস্থায় ইহা ঠিক জলের নীচেই ভাসিয়া বেড়ায়। কয়েক সপ্তাহ এইরূপ অবস্থায় থাকিবার পর মশক-কীট গুটিরূপ (Pupa) গ্রহণ করে। এই সময়েও ইহারা জলের ঠিক তলে ভাসিতে থাকে। জলের তলে বাস করিবার সময় ইহাদের ল্যাজের উপরে একটি নল দিয়া ইহারা নিঃশ্বাস গ্রহণ করে। এই নলটির মুখ জলের উপরে ভাসে (৪)। গুটিরূপ ধারণ করিবার কয়েকদিনের মধ্যেই গুটির আবরণ ভেদ করিয়া পূর্ণাঙ্গ মশক-শিশু বাহির হয় (৫)।

মশক জীবনের দ্বিতীয় পর্ব্ব

মশা জীবের রক্ত পান করিয়া জীবন ধারণ করে। সেইজন্য রক্ত চুষিয়া খাইবার জন্য উহার মুখে একটি ফাঁপা সূঁচের মত অঙ্গ জন্মায়। ডাক্তারের
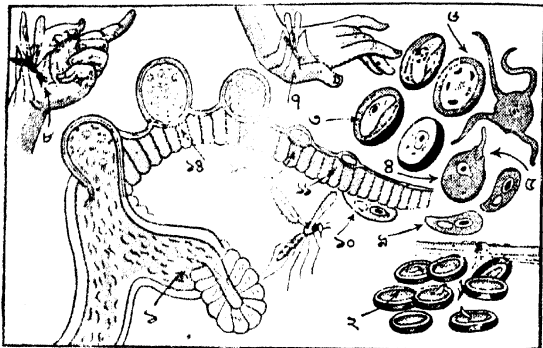
১। প্রাণী-বীজ মশার থুথু-গ্রন্থিতে প্রবেশ করিতেছে। ২ ও ৮। মশা মানুষকে কামড়াইলে ম্যালেরিয়া-প্রাণী বীজ মানুষের রক্তে প্রবেশ করিতে পারে। ৩ ও ৪। স্ত্রী-প্রাণী-বীজের ক্রমবিকাশ। ৫। পুং-প্রাণী-বীজের শুঁড় আসিয়া স্ত্রী-প্রাণী-বীজের সহিত মিশিয়াছে। ৬। পুং-প্রাণী-বীজের ক্রমবিকাশ। ৭। মানুষের রক্ত খাইয়া মশা ম্যালেরিয়া-প্রাণী-বীজ গ্রহণ করে। ১১, ১২, ১৩ ও ১৪। মশার পেটে প্রাণী-বীজের ক্রমোন্নতি। ৯। নূতন প্রাণী-বীজের জন্ম।

ইনজেকসন্ করিবার সূঁচের মত অনেকটা ইহা দেখিতে। এই তীক্ষ্ণ অঙ্গ বেঁধে ফুটাইয়া দিয়া মশা জীবের রক্ত চুষিয়া লয়।

যাহার ম্যালেরিয়া হইয়াছে, এমন লোকের রক্ত চুষিয়া লইলে মশকের পেটে গিয়া রক্ত মধ্যস্থ ম্যালেরিয়া-প্রাণী-বীজের এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটে।

রক্তবীজের স্ত্রী ও পুরুষ উভয় প্রকার প্রাণী-বীজ স্ত্রী-মশার পেটে গিয়া বাড়িতে থাকে এবং কালে পুরুষ-প্রাণী-বীজ স্ত্রী-প্রাণী বীজকে আশ্রয় করিয়া

প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। এইরূপে উভয় প্রকার প্রাণী-বীজের মিলনের ফলে মশার পেটে জন্মে এক প্রকার নূতন রক্তবীজ। এই রক্তবীজ মশার পেটের আবরণে বাড়িতে বাড়িতে ফাটিয়া পড়ে এবং অসংখ্য অণু-রক্তবীজের সৃষ্টি করে। অল্প-কালের মধ্যেই মশার পেটে লক্ষ লক্ষ অণু-রক্তবীজ উহার থুতু সৃষ্টি করিবার গ্রন্থিতে (gland) গিয়া জড় হয়। উহাও কামড়ের সময় থুতু-নলপথে ঐ অণু-রক্তবীজগুলি মানুষের রক্তের সহিত গিয়া মিশে।

তৃতীয় পর্ব্ব

ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাণী-বীজগুলি এইরূপে মানুষের রক্তের সহিত মিশিবার
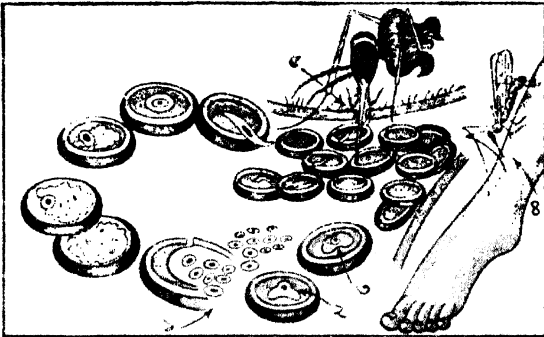
১। প্রাণী-বীজ ফাটিয়া গিয়া টাট্‌কা রক্তকণিকায় প্রবেশ করিতেছে। ২। স্ত্রী-প্রাণী-বীজ। ৩। পুং প্রাণী-বীজ। ৪। মশা মানুষকে কামড়াইতেছে। ৫। মশার কামড়ের সময় মধ্যস্থ ম্যালেরিয়া প্রাণী-বীজ মানুষের রক্তে প্রবেশ করিতেছে।

সুযোগ পায়। তাহার পর উহা রক্তের লাল কণিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুষ্ট হইতে হইতে বহু সংখ্যায় ফাটিয়া পড়ে এবং সেই সঙ্গে উহার আশ্রয়স্থল লাল কণিকাও ফাটিয়া গিয়া নষ্ট হয়। এইরূপে অতি শীঘ্রই মানুষের টাট্‌কা রক্তে

লাল-কণিকার ভাগ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নষ্ট হইয়া যায় এবং উহার রক্ত ম্যালেরিয়া প্রাণী-বীজে পূর্ণ হইয়া উঠে। এই চূর্ণ লাল রক্ত কণিকা খাইয়াই এ প্রাণী-বীজগুলি পুষ্ট হয় ও সংখ্যা বৃদ্ধি করে। দেখিতে দেখিতে কয়েকদিনের মধ্যেই রক্তবীজের বংশবিস্তারে মানুষের রক্তের প্রাণস্বরূপ লাল কণিকার অল্পতা ঘটে এবং ম্যালেরিয়া জ্বর দেখা দেয়।

১৫

প্রবালের কীর্ত্তি

প্রবাল এক প্রকার ক্ষুদ্র সামুদ্রিক জীব। ইহাকে প্রবালকীট বলা ভুল, কারণ কীটের অঙ্গগুলি প্রবালে বিকশিত হয় নাই। এই জীবে মুখ ও পেট জন্মিয়াছে। দেহের ফাঁক বা মুখ দিয়া একটি শুঁড় বাহির হইয়া আসিয়া সমুদ্র জল হইতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জল-জীব আহারস্বরূপ গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হয়।

বংশ বৃদ্ধি বিধি

সাধারণতঃ ইহা আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করে। সংখ্যা বৃদ্ধিকালে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া জীবন আরম্ভ করে না। পূর্ব্ব-পুরুষের গায়ে লাগিয়াই বাড়ে ও আবার পূর্ব্বের মত সংখ্যা বৃদ্ধি করে। পূর্ব্ব-পুরুষ মরিয়া গেলে উহার কোমল অংশ অদৃশ্য হয়, কিন্তু উহার কঙ্কাল থাকিয়া যায়। ফলে পুরুষপরম্পরায় বংশবৃদ্ধি করিতে করিতে মৃত পুরুষ-গুলির কঙ্কাল সমষ্টি অতি বৃহদাকার ধারণ করে। এই বৃহদাকার মৃত প্রবালের

কঙ্কাল সমষ্টি দৈর্ঘ্যে শত শত মাইল হইতে পারে এবং স্থূলতায় শত শত ফুটও হওয়ায় কোন বাধা নাই।
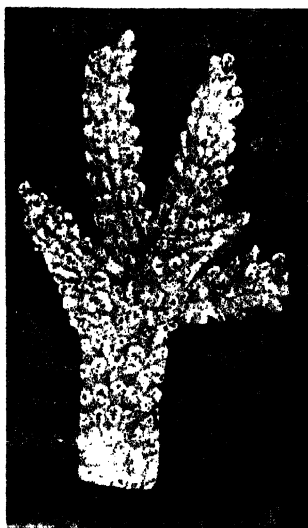
মৃত ও জীবিত প্রবালকীটের গুচ্ছ

এই জাতীয় জীবে প্রকৃতিদেবী প্রজনন প্রথায় একটা সংস্কার সাধন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। ইহারা কেবল মাত্র দ্বিধা বিভক্ত হইয়াই বংশবৃদ্ধি করে না; ইহাদের জন্ম ডিম হইতেও হয়। বংশবৃদ্ধির নূতন কৌশল প্রথম চালাইতে গিয়া প্রকৃতিদেবী পুরাতন প্রথা একেবারে ত্যাগ করেন না। নূতন প্রথায় পরীক্ষা যেন তাঁহারই এই জীবে শেষ হয় নাই, তাই তাঁহার এই সন্দেহ। ডিম দ্বারা জীবের বংশধারা বজায় রাখা তিনি পরীক্ষান্তে অন্য জীবাধারে চালাইয়াছেন।

প্রবালের ডিম্বগুলি জলে ভাসিয়া গিয়া অন্য কোন স্থানে প্রবালের নূতন একটি উপনিবেশ গড়িয়া তুলে।

প্রবাল বহু জাতীয় হয়। প্রতি জাতি প্রবাল আপন বিশেষ ঢঙে বাড়িয়া চলে এবং আপন কঙ্কাল গড়িতে সমুদ্রজল হইতে চুণ গ্রহণ করে। ইহাদের কোন কোন জাতি লৌহ বা অন্যান্য ধাতুজাত লবণ গ্রহণ করায় নানা বর্ণের প্রবাল দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রবাল দ্বীপের জন্ম

পৃথিবীর উপরিস্থ ভূখণ্ড স্থানে স্থানে ক্রমশঃ বসিতেছে বা উঠিতেছে। এই ভূখণ্ডের উঠার ফলে যেস্থানে এককালে সমুদ্র ছিল, সেস্থানে ডাঙ্গা দেখা দিয়াছে বা দিতেছে, আবার কোথাও উচ্চ ভূখণ্ড বসিয়া গিয়া সমুদ্রে অদৃশ্য হইতেছে।

যুগ যুগ ধরিয়া দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে ক্রমশঃ বসিতেছে, ফলে মহাসাগরের উক্ত অংশ ক্রমশঃ অধিকতর গভীর হইতেছে। ফলে যেস্থানে অতি প্রাচীন যুগে ছিল পর্ব্বতশ্রেণী, আজ উহা ক্রমশঃ বসিতে বসিতে ক্ষুদ্র দ্বীপে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

১। পাহাড়ের চূড়া ২। প্রবাল কীটের উপনিবেশ ৩। সমুদ্র

প্রবাল জীব গভীর সমুদ্রে বাস করিতে পারে না। ৫০।৬০ ফুট গভীর সমুদ্রে বাস উহাদের শেষ সীমা। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরেই বহু প্রবাল দ্বীপ দেখিতে পাওয়া যায়

উক্ত সমুদ্রে কোন বড় পাহাড় ধর লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া বসিতেছে। এই পাহাড়ের ঢালু গায়ে ৫০-৬০ ফুট গভীর সমুদ্রে শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কোন প্রবাল

১। মজ্জমান পাহাড়ের চূড়া ২। জীবন্ত প্রবাল কীটের উপনিবেশ
৩। সমুদ্র ৪। মৃত প্রবালের স্তূপ

জীব আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। মুখ ও উদরসর্ব্বস্ব জীব মুখ দিয়া ও শুঁড় বাড়াইয়া জীবকণা ধরিয়া খায়, বাড়ে, দ্বিধা বিভক্ত হইয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করে ও সময় হইলে মরে। এইরূপে সহস্র সহস্র বৎসর কালের কোলে লীন হইল। ঐ পাহাড়ের গায়ে উহাকে বেড়িয়া প্রবাল জীবের বংশ ঐ সময়ে বাড়িয়া চলিল।

১। নিমজ্জিত পাহাড়, উহার মাথায় হ্রদ গড়িয়া উঠিতেছে
২। জীবিত প্রবাল কীট ৩। সমুদ্র ৪। মৃত প্রবালের স্তূপ

প্রবাল ঊর্দ্ধদিকে বাড়ে। একটু করিয়া পাহাড় বসে, প্রবালের দলও বসিয়া থাকে না; তাহারাও ঊর্দ্ধদিকে বাড়িয়া চলে। কালে পাহাড় জলের তলে অদৃশ্য হইলেও অসংখ্য প্রবালের কঙ্কালে গড়া প্রবালের চক্রাকার বেড় জলে থাকিয়া যায়। ক্রমশঃ এই প্রবালের গণ্ডিবদ্ধ সমুদ্র জল হ্রদের মত দেখায়। এইরূপ হ্রদকে ল্যাগুণ (Lagoon) বলে।
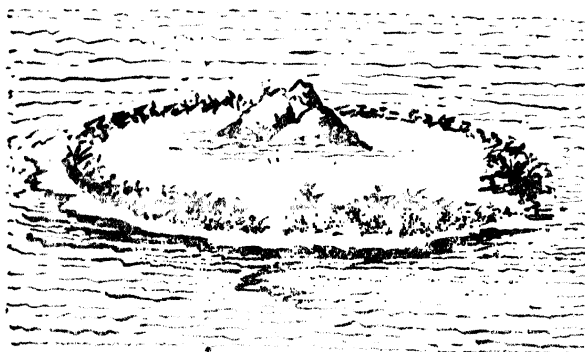
এই স্থলে পাহাড়ের চূড়া সম্পূর্ণ ডোবে নাই, অথচ চারিদিকে প্রবাল কীটেরা একটি বেড় গড়িয়া তুলিয়াছে

এইরূপ ল্যাগুণে সমুদ্র হইতে প্রবেশ করিবার কয়েকটি পথ অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ পাহাড়ের গায়ে বর্ষাকালে বৃষ্টির জল নামিয়া আসে। প্রবাল নোনা জল ছাড়া অন্য জলে বাস করিতে পারে না। যখন পাহাড়ের গায়ে চারিদিকে প্রবালের দলের পূর্ব্বপুরুষের কঙ্কালে একটা বেড় গড়িয়া উঠিতেছিল, সেই সময় বৃষ্টির জল যে পথে পাহাড়ের গা দিয়া সমুদ্রে আসিয়া পড়িত, সে পথে নোনা জলের অভাবে প্রবালের দল বাঁচিত না। সেইজন্য উত্তরকালে এই সকল স্থানে বেড়ের গায়ে ফাঁক থাকিয়া গিয়াছিল।

প্রবালের কঙ্কাল ঊর্দ্ধদিকে বাড়িয়াই চলে, সেইজন্য পাহাড় ডুবিয়া গেলে বেড়বদ্ধ হ্রদে (Lagoon) প্রবেশ করিবার পথ থাকিয়া যায়।

প্রবালদ্বীপে উদ্ভিদের জন্ম

প্রবালের দল দীর্ঘাকার বেড় গড়িয়া তুলিলে ঝড়ে, সমুদ্রের ঢেউয়ে বা অন্য কোন প্রাকৃতিক শক্তির সংঘাতে উহার অংশ বিশেষ ভাঙ্গিয়া পড়ে ; তখন ঐ ভাঙ্গা অংশগুলি ঢেউয়ের মুখে প্রবাল প্রাচীরের গায়েই আসিয়া পড়িয়া সমুদ্রকে আরও খানিক ভরাট করিয়া তুলে। ছোট বড় কাঠের টুকরা, সামুদ্রিক দল, মৃত জলচরের দেহাবশেষ এবং অন্যান্য, সমুদ্রে ভাসিয়া-আসা দ্রব্য, প্রবাল প্রাচীরের গায়ে বা উপরে আসিয়া পড়ে ও আগ্নেয়গিরি উৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশি বায়ুমণ্ডলের স্রোতে ঐ সকল স্থানে আসিয়া প্রবাল প্রাচীরের উপর বহুযুগে একটা মাটির স্তর গড়িয়া তুলে। তাহার পর দৈবাৎ সমুদ্রে ভাসিয়া আসে নারিকেল ও তৎসম কোন ফলের বীজ। এইগুলি আসিয়া প্রবাল দ্বীপে আশ্রয় পাইলে কালে অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষে পরিণত হয়।

জলের উপর আর প্রবাল জীব বাড়িতে পারে না, সেইজন্য ঊর্দ্ধদিকে খুব বেশী প্রবাল-দ্বীপ আর বাড়িতে পায় না। উহা প্রাচীরের পাশে পাশে বাড়িয়া দ্বীপের বিস্তার ক্রমশঃ বাড়াইয়া তুলে। বোর্ণিও দ্বীপে সমুদ্র হইতে শত শত ফুট উপরে প্রবাল প্রস্তরের পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়, উহার কারণ ঐ স্থানের ভূখণ্ড সমুদ্র হইতে উঠিয়াছে। কোনও দিন এই ভূখণ্ড সমুদ্র জলে ছিল এবং এস্থানে এক প্রবাল-প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছিল। ঐ স্থানের ভূখণ্ড ক্রমশঃ জল হইতে উপরে উঠায় প্রবাল-প্রাচীর পাহাড়ের চূড়ায় গিয়া উঠিয়াছে মনে হয়।

১৬

ঈল মাছের দৌড়

ইংরাজিতে একটা প্রবাদ আছে, "Truth is stranger than fiction"। প্রকৃতির অদ্ভুত লীলা লক্ষ্য করিলে ঐ প্রবাদের সার্থকতা ধরা পড়ে। অদ্ভুতত্বে সত্য ঘটনার নিকটে গল্প যে হার মানে, সে কথা ঈল মাছের জন্মস্থানে ফিরিয়া যাওয়ার ইতিহাস পড়িলে তোমরা বুঝিতে পারিবে। এই ইতিহাস এত অদ্ভুত যে অকাট্য প্রমাণ না থাকিলে সাধারণ লোকে বিশ্বাস করিলেও করিতে পারিত ; কিন্তু চাক্ষুস প্রমাণবাদী বৈজ্ঞানিক কিছুতেই উহা বিশ্বাস করিতেন না।

এই মৎস্যের আকার অনেকটা সাপের মত। আমাদের দেশের বাণ মাছ, ঈল মাছেরই কুটুম বলিয়া বোধ হয়। আঁশ ইহার চর্ম্মে গাঁথিয়া যাওয়ায় ইহাকে সাপের মত পিচ্ছিল দেখায়। ইহা সাধারণতঃ বাস করে ভূমধ্যস্থ জলাশয়ের সুস্বাদু জলে। সমুদ্র হইতে বহু দূরে ভূমধ্যস্থ জলাশয়ের সুস্বাদু জলে বাস দেখিয়া কে ভাবিবে যে ইহার জন্ম হইয়াছিল ভূখণ্ড হইতে বহুদূরে আটলান্টিক মহাসাগরের প্রায় মধ্যস্থলে অর্দ্ধ মাইল গভীর গর্ভে।

ঈল মাছের জন্মস্থান

আটলান্টিক মহাসাগরে আমেরিকার নিকটে বারমিউডাস্ নামে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ আছে। ইহারই নিকট অর্দ্ধ মাইল গভীর সমুদ্র গর্ভে গিয়া ঈল-জননী ডিম পাড়ে। ইহাকে যে জলাশয়ে বাস করিতে দেখা যায়, সেস্থানে ইহার ডিম বা পোনা পাওয়া যায় না।

প

ঈল মাছের সৃষ্টি-বেগ

বৎসরে এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে আপন বংশধারা বজায় রাখিবার জন্য ঈল মাছে একটা বেগ দেখা দেয়। এই অদম্য বেগে ঈল মৎস্য চঞ্চল হইয়া উঠে। তখন

ইহারা আপন বাসস্থানে ডিম না পাড়িয়া জন্মস্থানের অভিমুখে এক অন্ধ শক্তির বশে ছুটিয়া চলে। উহার কিছুতেই দিক্‌ভ্রম হয় না, তখন কোন বাধাই উহার পথরোধ করিতে পারে না। জলাশয় হইতে বাহির হইয়া নদী, নালা, মাঠ, ঘাট, পথ দিয়া ঈল মাছ আপন জন্মভূমি অভিমুখে অদম্য বেগে ছুটিয়া চলে। এমনও দেখা গিয়াছে যে গৃহস্থ বাড়ীর চৌবাচ্চায় ঈল মাছ জিয়াইয়া রাখিয়াছে, এমন অবস্থায় ঐ বেগ বশে উহা চৌবাচ্চা ডিঙ্গাইয়া বাহিরে আসিয়া বন্ধ দরজার সামনে উপস্থিত হইয়াছে ও অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়াছে। আবার গৃহস্থ উহাকে চৌবাচ্চায় ফেলিয়া দিয়াছে, পরদিন পুনরায় উহাকে ঐরূপ উদ্বিগ্ন অবস্থায় দরজায় নিকটে দেখা গেল। এইরূপ দিনের পর দিন, কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া চলিতে থাকে; দেখা যায় ঐ ঈল মাছ অদম্য বেগের বশে আপন সাথীগুলির সহিত মিলিয়া জন্মভূমির দিকে চলিতে না পারায় অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে।

ঈল ছানার রূপ

যখন ঈল-নারীর মধ্যে সৃষ্টি-বেগ দেখা দেয়, তখন উহার রূপের একটা পরিবর্ত্তন ঘটে। তখন উহাকে রূপার মত চক্‌চকে দেখায়। আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যস্থলে পৌছিয়া উহাদিগকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। উহারা প্রায় অর্দ্ধ মাইল গভীর স্তরে গিয়া ডিম পাড়ে। যথাসময়ে ডিম ফুটিয়া ঈল ছানা বাহির হয়; কিন্তু তখন উহাদিগকে দেখিলে মোটেই ঈল ছানা বলিয়া বোধ হয় না। জন্মকালে উহারা আকারে হয় সম্পূর্ণ চেপ্টা ও অতি ক্ষুদ্র। তখন উহাদিগকে ঈল মাছের মত মোটেই দেখায় না বলিয়া পূর্ব্বে লোকে উহার অন্য এক নাম দিয়াছিল।

অর্দ্ধ মাইল গভীর প্রদেশে সমুদ্র জলের এত চাপ যে ছানাগুলি জলের চাপের উপযুক্ত চেপ্টা আকার লাভ করে। তাহার পর আকারবৃদ্ধির সহিত উহারা ক্রমশঃ জলের উপরে উঠিতে থাকে। জলের উপরে উঠিয়া উহারা জন্মস্থান হইতে পিতামাতার বাসস্থান অভিমুখে এক অলক্ষ্য আকর্ষণবশে

ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করে। আটলান্টিক পাড়ি দিবার সময় উহাদিগের আকারের পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায় এবং শেষে ছানা-ঈলের মত দেখিতে হয়।

জন্মস্থান হইতে বাসস্থানে ফিরিয়া যাওয়া

জন্মস্থান হইতে ঈলছানার ইয়োরোপের নদীগুলির মোহানায় পৌঁছিতে প্রায় দুই বৎসর লাগে। বৎসরের একটা নির্দ্দিষ্ট সময় কোটী কোটী ছানা-ঈল নদীগুলির মুখ ছাইয়া ফেলে। মৎস্যজীবীদিগের মরসুম পড়িয়া যায়। লক্ষ লক্ষ ঈলছানা জালে ধরিয়া উহারা তখন বাজারে বেচিয়া দুই পয়সা অর্জ্জন করে। ইয়োরোপবাসীরা ঈলছানা ডিম মাখাইয়া ভাজিয়া খায়।

কোটী কোটী ঈলপোনা হাঁড়িতে করিয়া লইয়া গিয়া পুষ্করিণীতে ফেলা হয়। নদীর মুখে যে অসংখ্য ঈলপোনা জালে ধরা পড়ে না, উহারা নদীপথে সারাদেশে ছড়াইয়া পড়ে। সমুদ্রতল হইতে তিন হাজার ফুট উপরে সুইজারল্যাণ্ডের হ্রদগুলিতেও ঈল মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা কখনও নদী বা খালপথে আবার কখনও মাটির উপর দিয়া সাপের মত ছুটিয়া গিয়া ঐ উচ্চভূমিস্থ ঝিলে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

শুষ্ক মাঠে চলিবার জন্য ব্যবস্থা

এইরূপ মাঠে মাঠে মাছের ছুটিয়া চলা একটা আষাঢ়ে গল্পের মত শুনায়। কিন্তু কথাটা একেবারে নিছক সত্য। যে ছানাগুলিকে এইরূপে মাঠে চলিতে হয়, উহাদিগের মাথায় জল রাখিবার জন্য একটী জলপাত্র গজায়। এই জলপাত্রে জল থাকায় উহারা ঐ জলের সাহায্যে কানকো দিয়া নিঃশ্বাস লইতে পারে। অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে প্রকৃতির কোথাও ভুল হয় না।

ঈল মাছের আহার্য্য

ঈল মৎস্য অতি লোভী, বাগাইতে পারিলে সকল জীবই ধরিয়া পেটে পুরিয়া দিতে ছাড়ে না। জীবজন্তুর মৃতদেহ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাঙ পর্য্যন্ত বাদ যায় না। সুবিধা পাইলে বৃহৎ ঈলগুলিকে হাঁসের বাচ্ছাগুলির পা ধরিয়া জলের মধ্যে

১। ইয়োরোপীয় ঈলের ফিরিয়া আসিবার পথ   ২। ঈলের জন্মভূমি
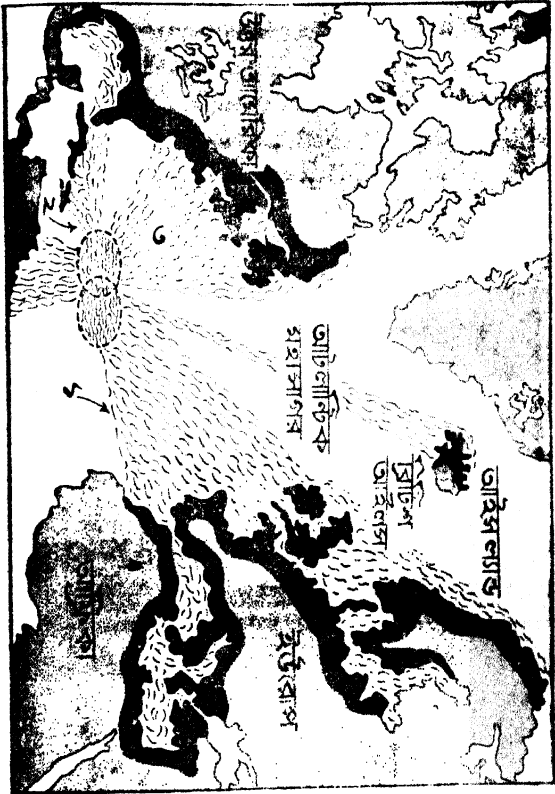
৩। আমেরিকার ঈলের ফিরিয়া আসিবার পথ

টানিয়া লইয়া গিলিয়া ফেলিতে দেখা গিয়াছে। কোন বক নিরীহ মৎস্য মনে করিয়া একটি বড় ঈল মাছে ছোঁ মারায়, উহা বকের গলা সাপের মত এমন ভাবে জড়াইয়া ধরিল যে বকের আঘাতে ঈল একা মরিল না, সঙ্গে বককেও লইয়া গেল।

ঈল মাছের প্রকৃতি

ঈল মাছের পুরুষ অপেক্ষা নারী যেমন আকারেও বড় হয়, তেমনি অধিক হিংস্র ও লোভী হয়। পুরুষ-ঈল কখন দুই হাত অপেক্ষা দীর্ঘ হয় না; নারী-ঈল কিন্তু চার হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইতে দেখা যায়। উহারা ওজনে ১২ হইতে ১৩ সের পর্য্যন্ত হয়। ইহারা পূর্ণাঙ্গ লাভ করে প্রায় ছয় বৎসরে। আঁশ-দেহ সাধারণ মাছের পক্ষে পথ, ঘাট, কাঁটাবন পাড়ি দেওয়া অসম্ভব, কিন্তু সাপের মত পিচ্ছিল-দেহ ঈল মাছের পক্ষে উহা সহজসাধ্য। উহাদের চর্ম্মের গ্রন্থি হইতে এক প্রকার রস প্রচুর ক্ষরণ হয়, এই রসে চর্ম্ম ভিজিয়া এমন পিচ্ছিল হয় যে শুষ্ক ভূমি পার হইতে উহাদের কষ্ট হয় না।

আর একটা অদ্ভুত কথা এখনও বলা হয় নাই। আমেরিকা ও ইয়োরোপ উভয় ভূখণ্ড হইতেই ঈল মৎস্য ডিম পাড়িবার জন্য একই স্থানে গিয়া উপস্থিত হয়। উহাদিগের পোনাগুলি কিন্তু কি করিয়া ঠিক পথ চিনিয়া আপন আপন পিতামাতার বাসভূমিতে ফিরিয়া যায়, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আমেরিকার ঈলের পোনাগুলি ঠিক আমেরিকার দিকেই ছুটে। উহা কোন দিনই ভুল করিয়া ইয়োরোপের দিকে যায় না। উহাদিগের দৈহিক বৈশিষ্ট্য হইতে এই ব্যাপারটি ধরা পড়ে। ইয়োরোপীয় ঈলের ছানাগুলিও ঐরূপে ভুলিয়া কখনও আমেরিকার দিকে যায় না।

১৭

বাংলায় বন্যা ও ম্যালেরিয়া

বন্যার জল ও মাটির সার

বাংলায় বৃষ্টি হয় প্রায় ৫০ ইঞ্চি বৎসরে। যদি জলসেচের ব্যবস্থা নাও থাকে, চাষ আটকায় না। বৃষ্টির জলেই বাংলার মাঠে প্রচুর ধান হয়। কিন্তু ফসল দিতে দিতে মাঠ সার শূন্য হইয়া পড়ায় উর্ব্বরতা কমিয়া যায়। আধুনিক কালের মত এত কৃত্রিম সারের ব্যবস্থাও পূর্ব্বে ছিল না এবং দীন প্রজার পক্ষে তাহা সংগ্রহ করাও সম্ভব নহে। তাঁহারা কিন্তু মাঠে সার যোগাইবার এক অতি সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

তাঁহারা দেখিলেন গঙ্গা বা দামোদরের বন্যার পথে যে লাল পলিমাটি জল-স্রোতে ভাসিয়া আসে তাহার উর্ব্বরতা শক্তি প্রচুর। বাংলা সমতল ভূমি, এই সমতলভূমির উপরে যদি বন্যার জল ছড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে জমি বন্যার জলের লাল পলিমাটী পাইয়া আবার উর্ব্বরা হইয়া উঠিবে। তাঁহাদের এই আবিষ্কার কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহারা নদী হইতে প্রশস্ত অগভীর কতকগুলি খাল দুই পার্শ্বের সমতল ভূমির মধ্য দিয়া কাটিয়া লইয়া গেলেন। নদীতে বন্যা আসিলে সূক্ষ্ম পলিমাটি পূর্ণ লাল জল এই কাটা খাল-পথে প্রবেশ করিত এবং স্থূল কঙ্কর প্রস্তরাদি নদীগর্ভে থাকিয়া যাইত। খালগুলি নদীর জলে পূর্ণ হইলে কৃষকেরা সেই প্রাণপূর্ণ জলরাশি নিজেদের ক্ষেতে চালাইয়া দিত। এক সময় সারা দেশ এইরূপ সমান্তরাল খালে পূর্ণ ছিল। এই খালগুলি বন্যার সময় মাটীর প্রাণস্বরূপ লাল পলিমাটী সারা দেশে ছড়াইয়া দিত। এই খালগুলি এতই প্রাচীন যে কে কবে সেগুলি খুঁড়িয়াছিল তাহা সঠিক জানা যায় না। ইহা হইল স্বাধীন হিন্দু বাংলার কথা। তাহার পর উপর্য্যুপরি রাজনৈতিক ভাগ্যবিপর্য্যয়ে প্রায় পাঁচ শত বৎসর এ দিকে কাহারও দৃষ্টি রহিল

না। ফলে আজ পৃথিবীর এক অতি উর্ব্বরা স্বাস্থ্যকর ভূখণ্ড উষর ও ম্যালেরিয়া আক্রান্ত ভয়াবহ শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

বন্যার জল ও ম্যালেরিয়া

ইংরাজ ডাক্তার বেণ্টলী বাংলা দেশের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন। ম্যালেরিয়া ও জলসেচের সম্পর্কে তাঁহার গবেষণা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তাঁহার মতে নদীর ঘোলাজল ক্ষেতে গিয়া ম্যালেরিয়ার মূল নষ্ট করে। আমাদের দেশে প্রথম বর্ষায় মাটি ভাল করিয়া ভিজিয়া উঠিলে কৃষক জমিতে লাঙ্গল দিয়া বীজ বপন করে। বাংলা নিম্নদেশ বলিয়া এখানের বৃষ্টির জল নিকাশ হইতে না পারিয়া চারিদিকে সাময়িক জলার সৃষ্টি করে। এইরূপ বদ্ধ জলা মশার ডিম পাড়িবার অতি উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র।

মশা এই সকল জলায় কোটী কোটী ডিম পাড়ে, কিন্তু এই ডিমগুলি পূর্ণাঙ্গ মশায় পরিণত হইবার পূর্ব্বেই নদীতে বন্যা দেখা দেয়। এই বন্যার জলে থাকে কোটী কোটী মাছের ডিম। সেই জন্য বন্যার জল যখন ধানের ক্ষেতে প্রবেশ করে, তখন সেই জলে ভাসিয়া-আসা মাছের অসংখ্য ডিম ফুটিয়া সংখ্যাতীত মাছের পোনায় ধানের ক্ষেত ছাইয়া ফেলে। এই মাছের পোনাগুলি মশার ডিমের মহাশত্রু। উহারা ঐগুলি আহার করিয়া বাড়িতে থাকে। ফলে একদিকে মশককূলও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, অন্যদিকে প্রচুর মৎস্য ধানের ক্ষেতে জন্মিয়া বাঙ্গালীর খাদ্য যোগায়। এই অদ্ভুত ব্যবস্থার ফলে দেশে ম্যালেরিয়া ছিল না এবং প্রতি বৎসর প্রচুর ধান্য ও মৎস্য পাইয়া বাঙালী খাইয়া বাঁচিত।

বার্ণিয়ারের বিবরণ

১৬৬০ খৃষ্টাব্দে বার্ণিয়ার বাংলা দেশে ভ্রমণ করিতে আসেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়া গিয়াছেন: আমি দুইবার বাংলা দেশে আসিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে মনে হয় মিশর অপেক্ষা বাংলা দেশ বহুগুণ উর্ব্বর। বাংলা হইতে প্রচুর তুলা, চাউল, চিনি, রেশম বিদেশে রপ্তানি হয়। দেশে যে পরিমাণে

গম, তরিতরকারি, হাঁস, মুরগী পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় এই দেশের কোন অভাবই নাই। তাহা ব্যতীত মেষ, ছাগ, শূকরের পালও অসংখ্য, মাছের ত শেষ নাই। রাজমহল পাহাড় হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত খালের সংখ্যা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এইগুলি যে কবে কাটা হইয়াছিল কেহ বলিতে পারে না। খালগুলি নৌকা যাতায়াতের পক্ষে প্রশস্ত।

ইহার প্রায় দেড় শত বৎসর পরে হ্যামিল্টন সাহেব ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে একবার বাংলা দেশে বর্দ্ধমান বিভাগে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বৃত্তান্তে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে ভূমির উর্ব্বরা শক্তির তুলনায় সারা ভারতে বর্দ্ধমানের মত দেশ নাই।

মাছের ডিম
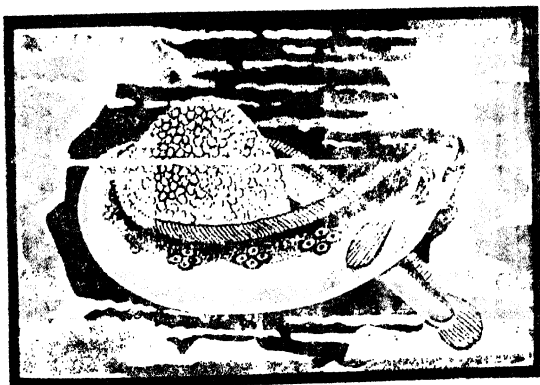
নারী বা পুরুষ মাছ আপন ডিম বহিয়া লইয়া চলে। ইহাদের আপন ডিম কোথাও রাখিয়া বিশ্বাস নাই। এইরূপ মাছ ইংলণ্ডের উপকূলে দেখা যায়।

ডিম হইতে ছানা

ডিম হইতে জীবের ক্রমবিকাশের রহস্য অতি অদ্ভুত। ডিমের মধ্যে ভ্রূণ কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকে ও বাড়ে এবং যথাকালে ডিম ফুটিয়া পিতামাতার

ডিম হইতে জীবের ক্রমবিকাশ

মত পূর্ণাঙ্গ জীবরূপে বাহির হয় তাহা বুঝিবার জন্য একটি মুরগীর ডিমের অন্তর্দেশের চিত্র দেওয়া গেল।

চিত্রের ১। ভ্রূণ, উহা ডিমের কুসুম বা হরিদ্রাংশের মধ্যে ডুবিয়া আছে। ২ ও ৬। দুইটি বাঁধন দিয়া এ ভ্রূণ ও কুসুম একটি শ্বেত রসপূর্ণ (৪) থলির (৩) মধ্যে ঝুলিয়া আছে। ৫। ডিমের শক্ত খোলা। এই খোলার অসংখ্য ছিদ্র দিয়া ভ্রূণ নিঃশ্বাস গ্রহণ বা ত্যাগ করে। ভ্রূণ কুসুম ও ডিমের শ্বেতাংশ আহার রূপে গ্রহণ করে।